বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর

ও বাঙালী সমাজ

প্রথম খণ্ড । ভূমিকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ-- কার্তিক ১৩৬৪

প্রকাশক—শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক—শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদ
শ্রী সত্যজিৎ রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

বাবা-র স্মৃতি-উদ্দেশে

বিষয়

চিত্র

* ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানা
থেকে গৃহীত প্রতিলিপি

লেখকের অন্যান্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
জনসভার সাহিত্য
বাদশাহী আমল
কলকাতা কালচার
কালপেঁচার বৈঠকে
কালপেঁচার নকশা
কালপেঁচার দু'কলম

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' প্রধানত উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস। গত প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বাংলার 'রেনেসাঁসে'র বা নব-জাগরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে এবিষয়ে যথাসাধ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদির অনুসন্ধান ও অনুশীলন করেছি। অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করি নি। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' সেই প্রচেষ্টারই প্রথম নিদর্শন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন কেন্দ্র করে এই ইতিহাস কতকাংশে রচনা করার কারণ আছে। প্রথম কারণ, এত বিচিত্র ও বিরোধী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, উনিশ শতকে আর কোন বাঙালীর জীবন ও চরিত্র গড়ে উঠেছে কি না সন্দেহ। এইদিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবন আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, উনিশ শতকের মধ্যাহ্নকাল, বিদ্যাসাগরের জীবনেরও মধ্যাহ্নকাল। বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে বিদ্যাসাগরের স্থান। তার মধ্যগগনে তিনি দীপ্যমান। প্রথম পর্বের জোয়ারের অতিবেগ এবং পরবর্তীকালের ভাঁটার ঘোলাটে মন্দস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে, দুয়েরই অতিমাত্রতা অতিক্রম করে, বিদ্যাসাগরই প্রথম, কর্মের ও চিন্তার ক্ষেত্রে, এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের বাস্তব ভিত্ রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর কর্মধারা, আদর্শ নীতি ও চিন্তাধারার মধ্যে বাংলার নব-জাগরণের মূলসুরটি যেভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তেমন আর কারো মধ্যে হয় নি। এই কারণেই বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত বাংলার নব-জাগরণেরই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলে মনে হয়। তৃতীয় কারণ, ১৮২০ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের তরঙ্গায়িত গতির মধ্যে তৎকালের বাংলার সামাজিক জীবন স্বভাবতই তাই সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। কোন ব্যক্তির জীবন বা চরিতকথা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাক্রম নয়, অথবা একসূত্রে গাঁথা কতকগুলি কাহিনীর মালা নয়, তথ্যের যন্ত্রবৎ সংকলনও নয়। সমাজ-জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের যোগ প্রত্যক্ষ ও গভীর। তাই উনিশ

শতকের সুবিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত রচনার প্রয়োজন আছে, প্রকৃত ইতিহাসের স্বার্থে এবং বিদ্যাসাগর-চরিত্রের রূপায়ণের দিক থেকে।

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' তিনখণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। 'প্রথম খণ্ড' সমগ্র রচনার ভূমিকা-রূপে পাঠ্য। বিদ্যাসাগরের জীবনের ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে ছয়টি রচনা 'প্রথম খণ্ডে' প্রকাশিত হল, সেগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা'-রূপে প্রদত্ত ভাষণ। ১৯৫৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা'র উদ্‌যাপন করেন এবং আমাকে তার প্রথম 'লেকচারার' মনোনীত করে সম্মানিত করেন। তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ১৯৫৬ সালের ৩০ জুলাই একটি, এবং ১৯৫৭ সালের ২৯ জুলাই থেকে ২ অগস্ট পর্যন্ত পাঁচটি 'লেকচার' আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি। 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর' নামে আমার আসল লেখাটি যখন 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় (১৯৫৫-৫৬ সালে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন এই 'বক্তৃতা'-গুলি, যাতে তার 'ভূমিকা'-রূপে পাঠ্য হতে পারে, সেইভাবে আমি প্রস্তুত করেছিলাম। কেবল বিদ্যাসাগরের জীবনের নয়, বাংলার রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে অনেক জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেছি এই রচনাগুলির মধ্যে। পরবর্তী দুইখণ্ডের সুবিস্তৃত ইতিহাস ও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্র বুঝতে হলে (অন্তত লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে) 'প্রথম খণ্ডে'র এই রচনাগুলি ভূমিকা-রূপে তাই অবশ্যপাঠ্য। 'দ্বিতীয় খণ্ডে' ১৮২০-১৮৫০ সাল পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। 'তৃতীয় খণ্ডে'র বিস্তার ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা'-গুলি এইভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। 'বেঙ্গল পাবলিশার্সে'র পরিচালক সাহিত্যিক-সতীর্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সর্বাঙ্গসুন্দর করে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত ও উৎসাহিত করেছেন। অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক দলিলপত্রের মধ্যে যেগুলি প্রয়োজনীয়, সেগুলির

‘ফটোস্টাট’ প্রতিলিপি এবং সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বহু চিত্র পরবর্তী দুই খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক ও অনুসন্ধানী, এই দুরূহ কাযে আমাকে নানাদিক থেকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণস্বীকার করছি। পরবর্তী দুই খণ্ডে যথাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে তাদের কথা উল্লেখ করব। এখানে কেবল এইটুকু বলছি যে তাঁদের সাহায্য না পেলে, অনেক নূতন তথ্যের ও উপকরণের সন্ধান পাওয়া এবং সেগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়ত আমার পক্ষে সহজে সম্ভব হত না।

কলিকাতা
১২ আশ্বিন, ১৩৬৪
১৩৭-তম বিদ্যাসাগর জন্মদিন
২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

বিনয় ঘোষ
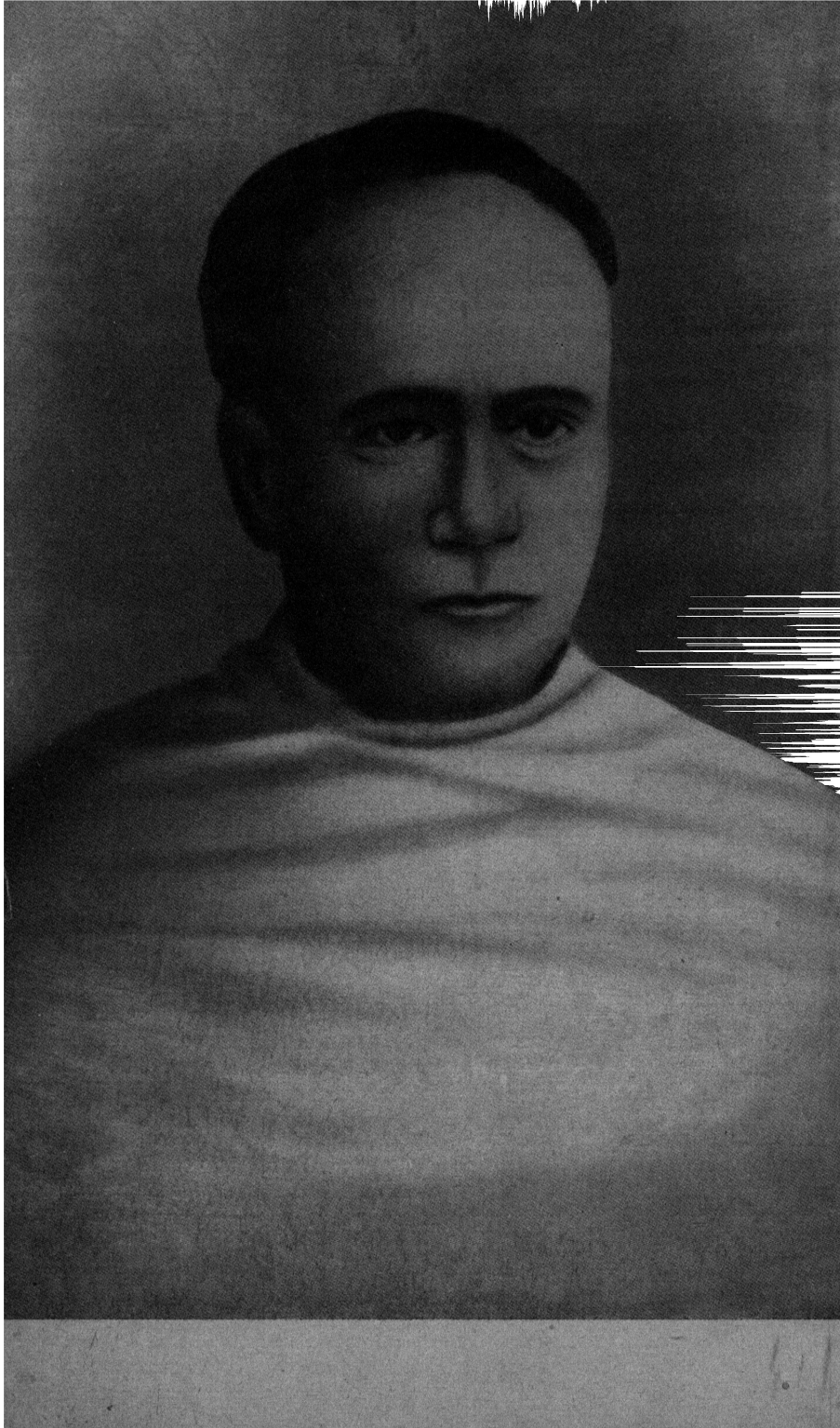
১ নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর

আমাদের এই মানুষের সমাজে, দেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ। তপস্যা করে জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সহজে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহর-কালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ যত স্বল্পায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, কোন অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

অনেক মানুষের দৈহিক গড়ন-শ্রীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তার সঙ্গে প্রতিভা ও কর্মগৌরব মিশে, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে আরো বেশি দুর্দমনীয় করে তোলে। বিদ্যাসাগব এই স্বাভাবিক সম্পদটুকু থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। শীর্ণদেহের উপব উন্নতললাট প্রকাণ্ড একটি মাথা ছিল বলে, ছাত্রজীবনে তাঁর সহপাঠীবা তাঁকে 'যশুবে কৈ' বলে ঠাট্টা করতেন। অতিদবিদ্র পরিবারে, মোটা চালের ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছেন যিনি, তাঁব দেহ থেকে লাবণ্য বা কান্তির দ্যুতি বিচ্ছুবিত হবার কথা নয়, হতও না। পরবর্তী-কালে যখন বিদ্যাসাগর স্বনামধন্য পুরুষ হয়েছিলেন, তখনও তাঁর দর্শনপ্রার্থীবা প্রায় সকলেই তাঁকে চোখে দেখে হতাশ হতেন।

এ সম্বন্ধে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। মনোমোহন গাঙ্গুলিব 'স্মৃতিকথা' থেকে সংগৃহীত। মনোমোহন গাঙ্গুলির পিতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বিদ্যাসাগরের ছাত্র ছিলেন। একদিন ববিবার সকালে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি গিয়ে দেখেন, তিনি বাগানে ঘাস নিড়চ্ছেন। নগেনবাবুকে দেখে বিদ্যাসাগর বলেন, 'যা, উপরে গিয়ে বস্‌গে যা, যাচ্ছি।' এমন সময় মেদিনীপুর থেকে চারজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ঘাস নিড়তে দেখে তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁকে বাগানের মালি মনে করে জিজ্ঞাসা করেন, 'ওহে, বিদ্যাসাগর মশায় বাড়ি আছেন কি?' নিড়ানি হাতে করেই তিনি উত্তর দেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন—আপনারা বসুন, তিনি একটু কাজে ব্যস্ত আছেন, একটু পরেই আসবেন।' কিছুক্ষণ বসবার পর তাঁরা বললেন, 'ওহে, একটু তামাক খাওয়াতে পার?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ পারি' বলে, বিদ্যাসাগর মশায় চারটি হুঁকোয়

চারজনকে তামাক সেজে এনে দেন। ভদ্রলোকদের তামাক খাওয়া শেষ হবাব পব, বিদ্যাসাগর ঘরে ঢুকে বলেন, 'এবারে কি দরকার, অনুগ্রহ কবে বলুন?' তাঁরা একটু বিরক্ত হয়েই উত্তব দেন, 'দবকারটা তোমাকে বলে কি হবে, তুমি একবার তাঁকে খবর দাও না!' তখন বিদ্যাসাগর নিরুপায় হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমিই বিদ্যাসাগর।' চারজনেই হুঁকো ফেলে লাফিয়ে উঠে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো হবে, বিদ্যাসাগরই বটে, তা না হলে কি এবকমটি হয়!'

কাহিনীটি লোকমুখে অতিরঞ্জিত হতে পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্যটুকুই যথেষ্ট। ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধরেই জনসমাজে এই ধরনের কাহিনী পল্লবিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁব মেট্রোপোলিটান ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন, এরকম দু-একজন অতিবৃদ্ধ যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদেব মুখে শুনেছি, একসময় গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণ-কলকাতায় কালীঘাটের কালীদর্শন করে, উত্তর-কলকাতায় বিদ্যাসাগরকে দর্শন করতে যেতেন। বিদ্যাসাগর যদি সাধক হতেন, যোগী বা সিদ্ধপুরুষ হতেন, অথবা সমাজের ধর্মগুরুর কর্তব্য করতেন, তাহলে তাঁর এই আকর্ষণশক্তিতে আশ্চর্য হবার মতন কিছু থাকত না। কিন্তু এসবের কোনটাই তিনি ছিলেন না। তাঁর দৈহিক আকর্ষণ তো ছিলই না, অভিজাত বংশের বংশধর বলেও কোন সামাজিক আকর্ষণ ছিল না। এমনকি তাঁর স্বভাব-সুলভ জড়তার জন্য তিনি সভাসমিতিতে লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত হতেন না, বক্তৃতাও দিতেন না। সেকালের সংবাদ-

পত্রে তখনকার সমাজনেতাদের আজকের মতন আত্মপ্রচারেরও সুযোগ ছিল না। তা সত্ত্বেও, কি কারণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই দুর্নিবার আকর্ষণশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, ভেবে দেখা দরকার। যে-সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতিপ্রাকৃত-লোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সমাজের মানসপটে বিদ্যা-সাগরের মতন এক মানবসর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায়, যুগের পরিবর্তন হয়েছিল বলে। তাঁর কালের আরো দুতিন শতাব্দী আগে জন্মালে বিদ্যাসাগর হয়ত নতুন ধর্মপ্রবর্তক হতেন, সাধারণ মানুষের কাছেও অবলীলাক্রমে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু সমাজ-জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, কেবল মানুষকেই জপ-তপ-ধ্যান-জ্ঞান করে, তিনি বহুমানুষের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতেন না। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণাই নবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ। এই চিন্তার জন্যই নবযুগ 'রেনেসাঁসের যুগ', নবজাগরণের যুগ। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই ঐতিহাসিক লক্ষণ সব-চেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগর-চরিত্রে।

মানবচিন্তার এই আদর্শকেই ইতিহাসে 'হিউম্যানিজ্‌ম' বলা হয়। অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোকের দেবতা থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের প্রতি, অদৃশ্য অলৌকিক জগৎ থেকে দৃশ্যমান বহির্জগতের প্রতি মানুষের চিন্তাধারাকে পরি-চালিত ও কেন্দ্রীভূত করাই 'হিউম্যানিস্ট'-এর আদর্শ। এই আদর্শই বিদ্যাসাগরকে সারাজীবন তাঁর দুঃসাহসিক সমাজ-কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নবযুগের বাংলার আদর্শ 'হিউ-ম্যানিস্ট' বিদ্যাসাগর। 'হিউম্যানিজ্‌ম' আর 'হিউম্যানি-

টেরিয়ানিজ্‌ম্‌'-এর অর্থ এক নয়। শুধু মানবপ্রেমও হিউম্যানিজ্‌ম নয়। ঐশচিন্তায় মগ্ন ব্যক্তিও মানবপ্রেমিক হতে পারেন। হিউম্যানিজ্‌ম হল মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা। বিদ্যাসাগর এই অর্থে হিউম্যানিস্ট। অসহায় নিপীড়িতের সমাজে স্বভাবতই তিনি 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, বদান্যতা, মহানুভবতা, মাতৃ-ভক্তি, সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও, ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। 'ঐতিহাসিক মূল্য' কথাটির উপর জোর দিয়ে বলছি। যুগে যুগে বহু মানুষের মধ্যে এইসব মহৎ গুণের সমাবেশ হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সব সময় এইসব গুণের প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাঁদের সেইসব গুণের সমাদর হয় না। কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিদ্যাসাগরের মতন ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হল এই হিউম্যানিজ্‌ম, এই মানবতন্ময়তা, এই মানবাচ্ছন্ন চেতনা। মানব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপরে ছিল তাঁর মানবচেতনা। এই চেতনাই ঐতিহাসিক।

মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে এই চেতনা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন যুগে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যখন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ছিল, বৈষম্যের বিষ যখন সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত জর্জরিত করে তোলে নি, তখন মানুষের আচরিত ধর্মের সঙ্গে যাপিত জীবনের সংযোগও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নি। পরলোকের চিন্তা করেও মানুষ তখন ইহলোকের কথা ভুলে যেত না, দেবতা ও নিয়তির

অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেও, মানুষ নিজের শক্তির উপর আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। তার পর, সুবিস্তীর্ণ মধ্যযুগের বিভিন্ন পর্বে মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন স্থিতিশীল ও কূপমণ্ডূক হয়ে উঠল, ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন মানুষের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল যে, নিজের সত্তার চৈতন্য পর্যন্ত তার প্রায় লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, সামাজিক সুষুপ্তির ঘোর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ভিতরেব ও বাইরের নব-উন্মেষিত শক্তির আঘাতে সেই সুপ্তির ঘোর কেটে যায়, মানুষ ও সমাজ আবার এগিয়ে চলে। ইতিহাসের ধর্মই তাই। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে ইয়োরোপে যে নতুন সামাজিক শক্তির অভ্যুদয় হয়, তারই আঘাতে মানুষের এই সুপ্তির ঘোর কাটতে থাকে। বর্ধিষ্ণু ধনিক-বণিক-শ্রেণী নিজেদেরই অগ্রগতির স্বার্থে মানুষের মন ও বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত করতে সচেষ্ট হন। তার জন্য তাঁদের একটি 'মডেল'এর প্রয়োজন হয়। পুনরনুসন্ধান করে এই 'মডেল' তাঁরা ইতিহাসের প্রাচীন যুগে আবিষ্কার করেন। মানববিদ্যা ও মানবজ্ঞানের মনন করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। মানুষের চিন্তার রাজ্যে, নির্বাসিত মানুষ ও পৃথিবী প্রত্যাবর্তন করে। মানুষের এই নবচেতনাকেই ইতিহাসে বলা হয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁস।

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদকে বলা হয় 'রেনেসাঁস'—আধুনিক যুগের শৈশবকাল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে, প্রথম এই যুগবিচ্ছেদের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই ফ্লোরেন্সকে বলা হয় আধুনিক ইয়োরোপের 'মডেল' বা 'প্রোটোটাইপ'। দুতিন-শ বছর পরে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ

শতাব্দীতে, ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসে, বাংলার সমাজে রেনেসাঁসের এই লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। কেবল হিউম্যানিজ্‌মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, antiquityকে model করে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের আন্দোলনে অগ্রসর হন। প্রাচীন শাস্ত্রকেই তাঁরা সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেন। এও নবযুগেরই অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের প্রধান জীবনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র ছিল গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ। এই জীবনকেন্দ্র আধুনিক যুগে নগরে ও শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। বাংলাদেশে নবযুগের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর। ফ্লোরেন্স যদি আধুনিক নবযুগের ইয়োরোপের 'প্রোটোটাইপ' হয়, তা হলে বাংলাদেশের কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে নবযুগের ভারতের ফ্লোরেন্স বলা যেতে পারে। আট বছরের বালক বিদ্যাসাগর, ১৮২৮ সালে, যখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস ও পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্তের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে পায়ে হেঁটে, মাইলস্টোন গুণতে গুণতে এসেছিলেন, তখন তিনি নবযুগের ফ্লোরেন্সেই এসেছিলেন, মধ্যযুগের তীর্থনগরে বা বন্দর-পত্তনে আসেন নি। মধ্যযুগের স্থিতিশীল জীবনকেন্দ্র থেকে আধুনিক যুগের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনকেন্দ্রে এসেছিলেন তিনি—একটির পর একটি নিশ্চল শাস্ত্রীয় অনু-শাসনের পাথুরে মাইলস্টোন অতিক্রম করে। শহরে এসে, দীর্ঘ বারো বছরের ছাত্রজীবনে তিনি নবযুগের ব্যক্তিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, ডিরোজিওর শিষ্য, হিন্দু কলেজের ছাত্র, 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মধ্যে এই আত্মচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের যে নির্বিচার

প্রকাশ হয়েছিল, খুব কাছাকাছি থেকে তিনি তা দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন।[১] এমনিতে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ দোষের নয়। নবযুগের রেনেসাঁসের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বোধ হয় এই individuality, এই ব্যক্তিত্ববোধ। আগে 'ব্যক্তি' হিসেবে মানুষের কোন চেতনা ছিল না। বংশ, গোত্র-গোষ্ঠী, সংঘ-জন-জাতি ইত্যাদি সাধারণ categoryর সঙ্গে তার সত্তা অভিন্ন ছিল। চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই আত্মজ্ঞানহীন গোষ্ঠীচেতনা ও দলচেতনা নিম্নস্তরের চেতনা। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে মানুষের মধ্যে যখন এই স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগল, তখন তার অবরুদ্ধ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের পথ খুলে গেল চারিদিকে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-কলাসাহিত্য, সর্বক্ষেত্রে মানুষের আত্মনির্ভর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হল। রেনেসাঁসের ইতিহাস-রচয়িতা বুর্খার্ট বলেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে ফ্লোরেন্স শহরে এই স্বাতন্ত্র্যচেতনার এমন চরম প্রকাশ হয়েছিল যে পোশাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশান বলে শহরে তখন কিছু ছিল না। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র পোশাকের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করতে চাইত। বাংলাদেশে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ইয়ং বেঙ্গল দলও কতকটা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁরা unique individual হতে চেয়েছিলেন, আচারে-ব্যবহারে তো বটেই, পোশাকের দিক থেকেও। ১৮৭২ সালেও, লালবিহারী দে'র Bengal Magazine লিখেছেন :[২]

১ এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় খণ্ডে' (১৮২০-৫০) এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২ *The Bengal Magazine* : Edited by Rev. Lalbehari Day, vol. I, August 1872—July 1873

Young Bengal, with his fantastic and ever-varying dress, might have furnished them [the leaders of fashion in London], in his own person, parts of the national costumes of all countries of the world.

ইয়ং বেঙ্গলের এই পোশাক-বৈচিত্র্য তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধেরই প্রকাশ। কিন্তু, ইয়ং বেঙ্গলের এই আন্তর্জাতিক পোশাক-প্রদর্শনীর মধ্যে চৌবন্দি ফতুয়া ও সাদা চাদর গায়ে, তালতলার চটিজুতো পায়ে বিদ্যাসাগরের শুভ্রমূর্তিটি যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখনই বোঝা যায়, দুটি ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বাহ্য প্রেরণা অভিন্ন হলেও, তাদের বনিয়াদ ভিন্ন।

যা কিছু চিরাচরিত, যা কিছু গতানুগতিক, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইয়ং বেঙ্গল তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এমনকি, নিজেদের জাতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেও তাঁদের মধ্যে অনেকে কুণ্ঠিত হন নি। স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ হলেও, ইতিহাসের উদারদৃষ্টিতে এ উচ্ছৃঙ্খলতা মার্জনীয় হত, যদি না তাঁরা বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ করতেন এবং স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মের আশ্রয় নিতেন। অবশ্য সকলে তা করেন নি। ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যেও দুটি দল ও দুটি ধারা ছিল দেখা যায়। কিন্তু তা হলেও, নির্বিচার অনুচিকীর্ষা যতখানি তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততখানি তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। বিদেশীর অধীনতাও তার জন্য অনেকটা দায়ী ছিল। কলকাতা শহর আর ফ্লোরেন্সের মধ্যে এই দিক থেকে পার্থক্য ছিল বিরাট। পরাধীন পরিবেশে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ যে কতখানি খর্ব হতে পারে, ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজিক বিকাশ ও

পরিণাম তার করুণ দৃষ্টান্ত। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের মতন দু-একজন শক্তিমান পুরুষ, যাঁরা নিজেদের প্রতিভার জোরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কেবল এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁরাও বৃহত্তর জনসমাজে, তাঁদের ক্ষমতার অনুপাতে, ব্যাপক নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একমাত্র বিদ্যাসাগরই ছিলেন এর বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। জীবনের প্রত্যেকটি কাজ-কর্মের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্বই সব সময় ফুটে উঠত, সেই বিশেষত্ব হল individuality, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যকে তিনি খণ্ডিত করেন নি। আধুনিক ইয়োরোপের বীজমন্ত্রটি তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলে, বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে বা আচার-ব্যবহারে তা তিনি কোনদিন প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। প্রকাশ করেছেন তাঁর চরিত্রে। ইংরেজি কেতাদুরস্ত ইয়ং বেঙ্গল দল ছিলেন অন্তরে বাঙালী, চরিত্রে বাঙালী, বাইরে ইয়োরোপীয়। ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস ও আবেগ-সর্বস্বতাই ছিল তাঁদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর ছিলেন মনেপ্রাণে আধুনিক ইয়োরোপীয় এবং তার জন্য বাইরের বাঙালিত্বটুকু তিনি বর্জন করেন নি। বাঙালী থেকেও তিনি পরিপূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় ব্যক্তিসত্তাকে নিজের সত্তার মধ্যে বিলীন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে আর কেউ বোধ হয় আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাবধারাকে নিজের চরিত্রে এমনভাবে আত্মসাৎ করতে পারেন নি। এইখানেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। কবি হেমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন :

উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি।

আতসবাজির মতন উৎসাহ অনেকের চরিত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে বাঙালীর চরিত্রে—যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি খপ্ করে নিবে যায়। কিন্তু গ্যাসের শিখার মতন উৎসাহ সমানভাবে অনির্বাণ থাকে ক'জনের চরিত্রে? বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর সমসাময়িক যে-কোনো আত্ম-সচেতন ব্যক্তির চেয়েও উগ্রতর ছিল। হেমচন্দ্রের ভাষায়, তিনি ছিলেন

স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।

কর্মজীবনে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে এই শেঁকুলকাঁটার দংশন অনুভব করেছেন। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্য-বোধের জন্যই তিনি বড় বড় সামাজিক আন্দোলনের নেতা হয়েও, কোনদিন কোন দল বা সমাজভুক্ত হতে পারেন নি। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্কার-আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত থেকেও, তিনি কোনদিন তাঁদের দলভুক্ত একজন হন নি। একমাত্র প্রত্যক্ষ কর্মের ক্ষেত্রেই তিনি সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করতেন। নির্দিষ্ট কোন কাজের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হত। কাজ ছাড়া যেন বাইরের সমাজের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক ছিল না। জনসভাতে তো নয়ই, সমসাময়িক বিদ্বৎ-সভার সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। বেথুন সোসাইটির মতন বিদ্বৎ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, তিনি তার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যে অংশ গ্রহণ করতেন তা মনে হয় না। সর্বত্রই তাঁর ব্যক্তিত্বের শেঁকুল-কাঁটাই ছিল অন্তরায়।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে এই প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস পাওয়া যেত। তাঁর পিতামহ তাঁকে পরিহাস করে

এঁড়ে বাছুর বলতেন। যত বয়স বাড়তে লাগল, দেখা গেল যে পিতামহের কথাই ঠিক। বর্ণপরিচয়ে গোপাল ও রাখাল নামে যে দুটি বালকচরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল বেশি। পিতা যা বলতেন, তিনি প্রায়ই ঠিক তার উল্টো করতেন। তার জন্য তিনি পিতার কাছে যথেষ্ট প্রহারও খেয়েছেন। শেষকালে উল্টো কথা বলে তাঁকে দিয়ে সোজা কাজটি করাতে হত। তাঁর বাল্যকালের এই একগুঁয়েমি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভাল চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।

ছেলেবেলা থেকে যাঁর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এত সজাগ ছিল, নিজের কাজকর্মের স্বাধীনতায় যিনি অন্যের সামান্য হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না, তিনি যে যৌবনে ও পরিণত বয়সে স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ'এর এক জায়গায় বলেছেন যে সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলে, তিনি স্বদেশবাসীর কাছে অত খাতির পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন :

সাহেবদের নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, এ কথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকমলের মতন বুদ্ধিমান পণ্ডিতও তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণে কতকটা ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, সাহেব-সমাজে বিদ্যাসাগরের যে প্রতিপত্তি ছিল তা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের প্রতিপত্তি নয়, শিরোপাধারী রাজামহারাজাদেরও প্রতিপত্তি নয়। অর্থের বলে বা বিদ্যার বলে, সে প্রতিপত্তি তিনি লাভ করেন নি। এ সমাজে শাসকশ্রেণীর কাছে তাঁরাই খাতির পান যাঁরা বিত্তবান। বিদ্যাসাগর বিত্তবান ছিলেন না। বিদ্যা তাঁর ছিল, কিন্তু সে বিদ্যা আরো অনেকের ছিল, 'বিদ্যাসাগর' উপাধিও একাধিক পণ্ডিতের ছিল। সাহেবদের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল তাঁর চরিত্রের জন্য। নিজেদের চরিত্রের যা-কিছু মহৎ গুণ, তার সবগুলি তাঁরা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্রে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই, সাহেবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা থেকে অন্তত এইটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রসাদলোভী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করেন। বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরেজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত তীব্র ছিল যে, কর্মক্ষেত্রে সাহেব রাজপুরুষ বা কর্মচারিদের সঙ্গে যখনই তাঁর সংঘাত হত তখনই তাঁদের প্রতিঘাত করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেছেন। সকলেই জানেন,

কার সাহেব একদিন টেবিলের উপর জুতো-সুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসে, পাইপ খেতে খেতে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। প্রতিদানে বিদ্যাসাগরও একদিন তাঁর সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। শিক্ষা কৌন্সিলের সেক্রেটারি কৈফিয়ত চাইলে তিনি উত্তরে যা জানান, তার মর্ম এই :

'আমি ভেবেছিলাম আমরা এদেশী নেটিব, অসভ্য, ভদ্রতা-ভব্যতা জানি না। কার সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকেই এই আচরণ শিখেছি। একজন সুসভ্য ইয়োরোপীয়ের এই আচরণ যে অশিষ্ট হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাবলাম, এই বোধ হয় আপনাদের অভ্যর্থনার রীতি। তাই আমি এদেশী রীতিতে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে, তাঁরই কাছ থেকে শেখা রীতি অনুযায়ী সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করেছি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তার জন্য আমি দোষী নই।'

জবাবের মধ্যে তীব্র শ্লেষের ঝাঁজ লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগরী বাগ্‌ভঙ্গির একটা বিশিষ্ট রীতি। প্রতিঘাত করবার সময় তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যের শেঁকুলকাঁটাটি নির্মমভাবে প্রতিপক্ষের দেহে বিঁধিয়ে দিতেন। বিশেষ করে বিদেশীদের। বুঝিয়ে দিতেন যে পৃথিবীর যে-কোন লম্বাচওড়া মানুষের তুলনায়, তিনি একজন শীর্ণকায় বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও, বড় ছাড়া ছোট নন।

কার সাহেবের গল্পটি অনেকেই জানেন। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৭৪ সালের ঘটনা। বিদ্যাসাগর একদিন কাশীর এক পণ্ডিতের সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরনে ধুতিচাদর আর পায়ে চটিজুতো ছিল। সোসাইটির বিল্ডিংএ তখন মিউজিয়ামও

ছিল। ভিতরে ঢোকার সময় দরোয়ান তাঁকে চটি খুলে রাখতে, অথবা হাতে করে নিয়ে যেতে বলে। বিদ্যাসাগর কোন কথা না বলে বাড়ি ফিরে আসেন। মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন তখন ব্লানফোর্ড। তাঁর কাছে তিনি চিঠি লেখেন এই মর্মে : 'সেদিন সোসাইটির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম, এদেশী লোক যাঁরা দেশী জুতো পরে গেছেন, তাঁদের জুতো খুলিয়ে হাতে করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে—আর যাঁরা চোগাচাপকান আর বিলেতি জুতো পরে গেছেন, তাঁরা জুতো পায়ে দিয়েই ভিতরে ঢুকেছেন। জুতোর ব্যাপারে এই অধিকারের পার্থক্য কেন, বুঝতে পারলাম না।' এসিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের কাছে তিনি চিঠি লেখেন। চটিজুতোর মর্যাদা নিয়ে সোসাইটির মতন বিদ্বৎ-সভাতেও আলোচনা হয়। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হন :

If the leaving the shoes behind is a mark of respect, it matters little whether the shoes are of European or the native pattern. But if there is a mark of respect attached to the leather, it is immaterial as to what form the leather may take. We hope the Council of the Asiatic Society and the Trustees of the Museum will have the good sense not to make native gentlemen feel that to enter their room is to court insult.

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মন্তব্য করেন :

The great shoe question has turned up in quite an unexpected quarter—we mean in the rooms of the Asiatic Society.

"The Great Shoe Question" ই বটে, বিশেষ করে যখন বিদ্যাসাগরের দেশী জুতো!

বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন: "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতোসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন:

> আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্যের মধ্যে।

রক্ষণশীলতা বা গতানুগতিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চটির কোন সুদূর সম্পর্কও নেই। বিদ্যাসাগরের চটি তাঁর তীব্র individualityরই প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। যে ব্যক্তি তাঁর নিজের লাইব্রেরির জন্য সখ করে বিদেশ থেকে বই বাঁধিয়ে আনতেন, ডাই-প্রিন্টেড খাম ও নামের কার্ড ব্যবহার করতেন, তিনি যে কারো চেয়ে কম শৌখিন ছিলেন তা মনে হয় না এবং কেবল বাইরে সারল্যপ্রকাশের জন্য তিনি চটিজুতো ব্যবহার করতেন না। কোন ঢিলেমি বা স্বভাব-শৈথিল্যের প্রকাশও তাঁর পোশাকের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত না। কৃষ্ণকমল বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর বরাবর চেয়ারে বসিতেন; কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' যিনি চেয়ারে ছাড়া, ফরাসে বসে গল্পগুজব পর্যন্ত করতেন না, তিনি যে ঢিলেমি বা লোক-দেখানো সারল্যের জন্য গায়ে একটা ফতুয়া ও চাদর এবং পায়ে তালতলার চটি পরতেন, তা কখনই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

স্বাতন্ত্র্যের নামে সমাজের মধ্যে যে উৎকেন্দ্রতার জোয়ার

এসেছিল, বিদ্যাসাগর তাঁর ফতুয়া চাদর ও চটিজুতো দিয়ে সেই জোয়ার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চটিজুতোকে তিনি এমন প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে একসময় কলকাতা শহরে তা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। চটিজুতোর সমস্যা রাজনীতির রঙে পর্যন্ত রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। Renaissance-এর individualityর সত্যকার প্রতীক ছিল বিদ্যাসাগরের 'তালতলার চটি'। ইয়ং বেঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য অনেক। একটি স্বাতন্ত্র্য পরগাছার ফুল, আর একটি স্বাতন্ত্র্য এদেশেরই বনজ সম্পদ, নতুন পরিবেশের আলোবাতাসে পরিস্ফুট।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে, বিদ্যাসাগরের আগে, এই অখণ্ড স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আর কারো মধ্যে তেমনভাবে প্রকাশ পায় নি, একমাত্র রামমোহনের মধ্যে ছাড়া। রামমোহন রায়েব বিদেশযাত্রা ও মৃত্যুব পর, ইয়ং বেঙ্গল দলই নবযুগের জীবনমন্ত্রের প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। নতুন সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলার ঐতিহাসিক গুরুভার তাঁদের উপরেই পড়ে। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান ও শক্তিমান পুরুষের অভাব ছিল না। অভাব ছিল অখণ্ড ব্যক্তিত্বের, যার বিকাশ একমাত্র দেশের মাটিতেই সম্ভবপর। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা, প্রধানত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়, সর্বসাধারণের চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ইত্যাদি এমন কোন বিষয় ছিল না, যা নিয়ে তখন আলোচনা হয় নি। বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বা উপলব্ধি থেকে কোন সমস্যা আবিষ্কার করেন নি। হঠাৎ কোন

রহস্যময় উৎস থেকে তিনি এই সব সমস্যা সমাধানের প্রেরণাও পান নি। বহু সমাজসচেতন ব্যক্তির মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। বহুজনের সঙ্গে তিনিও এইসব বিতর্ক ও আলোচনার খোরাক যুগিয়েছিলেন। ইতিহাসে কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবশ্যকতাবোধ কখনো কোন ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সমাজচেতনায় তা তরঙ্গায়িত হতে থাকে, তবেই সমাজচেতন কোন ব্যক্তির পক্ষে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগরও ঠিক তাই করেছিলেন। এই সমাজচেতনা যদি সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়, তা হলে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, এই সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের সংযোগস্থলে 'ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে'র উদ্ভব হয়।[৩] উনিশ শতকের মধ্যভাগে, বিদ্যাসাগরচরিত্রে এই সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার সংযোগের ফলে, নবযুগের বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তিনিই প্রথম সেই সমাজচেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, social reality-তে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্য বাইরের সামাজিক অবস্থাও তখন অনেকটা তৈরি হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের যুগ ছিল ডালহৌসির যুগ। ডালহৌসির যুগকে বলা হয়, conquest, consolidation ও development-এর যুগ। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নির্মাণ, দু'পয়সার ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, সবই কিন্তু নতুন গতিশক্তির উপকরণ। ১৮৫৩ সালে ডালহৌসি তাঁর

৩ দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বিদ্যাসাগর-চরিত্রের রূপায়ণ' পঠিতব্য।

বিখ্যাত 'রেলপথ প্রস্তাব' খসড়া করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে হাজার হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়ে যায় এবং কোটি কোটি পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন এদেশে খাটতে থাকে। ১৮৪৭ সালেও যে-পাব্লিক-ওয়ার্ক্স্ খাতে মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড গবর্নমেণ্ট ব্যয় করতেন, ১৮৫৬ সালের মধ্যে সেই পাব্লিক-ওয়ার্ক্স্ খাতে ব্যয়বরাদ্দ হয় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দশগুণ। এই পাব্লিক ইন্ভেস্টমেণ্টের ফলে দেশের income ও employment অনেকগুণ বেড়ে যায় (বিদেশীর মুনাফা আত্মসাৎ সত্ত্বেও), এবং সমাজ-জীবনে তার প্রকাশ হয় চাকুরিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর কলেবরস্ফীতিতে। ১৮৫৬-৫৭ সালের মধ্যেই প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করে। চলমান লোকের সংখ্যা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি চলার গতিও বাড়ে। পায়ে হেঁটে চলা, গোযানে চলা, পাল্কিতে চলা, নৌকায় চলা, আর রেলপথে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রবল বেগে চলার মধ্যে যুগান্তকারী পার্থক্য আছে। বাংলার সমাজ-জীবনে যে সময় এই নতুন গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়, নতুন চলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসার হয়, ঠিক সেই সময় বিদ্যাসাগর তাঁর প্রত্যক্ষ সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। সবেমাত্র তার শতবর্ষ পূর্ণ হল। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এদেশে প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ দেন বিদ্যাসাগর, কলকাতা শহরে। ১৮৫৬-৫৭ সালে তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুল স্থাপন করতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। সমাজ-জীবনের চারিদিকে যে নতুন গতিশীলতার বিচিত্র প্রকাশ হয়, বিদ্যাসাগর সেই গতিশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে কর্মজীবনে অগ্রসর হন।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের আর-এক বৈশিষ্ট্য হল এই dynamism, এই গতিশীলতা।

সামাজিক দিক ছাড়াও, আরো অন্যান্য দিক থেকে বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তার মধ্যে 'ধর্ম' হল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাঁর চরিত্রের আর কোন দিক বোধ হয় এরকম দুর্ভেদ্য রহস্যজাল বিস্তার করতে পারে নি। এত পরস্পর-বিরোধী জল্পনা-কল্পনাও হয় নি তাঁর জীবনের আর কোন দিক নিয়ে। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা ধর্ম ও ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর গম্ভীর স্তব্ধতায় বিমূঢ় হয়ে গেছেন, তার তলস্পর্শ করতে পারেন নি। তাই কেউ বলেছেন তাঁকে নাস্তিক, আবার কেউ বলেছেন সংশয়বাদী। কি যে তিনি তা শেষ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি না, করলেও কি দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন? ধর্মের প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল কি না, থাকলেও সে ধর্মের স্বরূপ কি ছিল? বিদ্যাসাগরের জীবনের এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জটিল এবং এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন হলেও, সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী বলে, তার সামাজিক গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। আজ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর কেউ দেন নি। বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমল বলেছেন:

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব

লইয়া হাস্যপরিহাস· কবিতেন! ললিত সে সময় যেন কতকটা যোগসাধনপথে অগ্রসব হইযাছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন: 'হ্যাঁরে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?' ললিত উত্তব দিতেন: 'আছে বৈকি। আপনার এত দান, এত দযা, আপনাব পবকাল থাকবে না তো, থাকবে কার?' বিদ্যাসাগর হাসিতেন।

বিদ্যাসাগর পরলোকে বিশ্বাস করতেন না বলে কৃষ্ণকমল কেন তাঁকে নাস্তিক বলেছেন জানি না। পরলোকে বিশ্বাস না করলেই যে নাস্তিক হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদ্যাসাগর অবশ্য ইহলোকেই বিশ্বাস করতেন, পরলোক মানতেন না। তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। কাহিনীটি শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে সংকলিত। একবার বিশেষ কোন কাবণে বিদ্যাসাগরকে প্রত্যহ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়। সেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় একদিন তাঁর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। বন্ধুর কাজকর্ম সেবে তিনি বারান্দায় বসে, মুড়ি খেতে খেতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর সভা-সমিতিতে যেতে পারতেন না বটে, কিন্তু মানুষ পেলে চমৎকার আসর জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। বালকদের সঙ্গেও। তিনি বসে গল্প করছেন, এমন সময় এক বাঙালী খৃস্টান পাদ্রি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বালকদের লক্ষ্য করে salvation সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন এবং যীশু ভজলে কি ভাবে যে salvation সম্ভব, তাও বোঝাতে লাগেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনবার পর, বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেন, 'ওদের ছেড়ে দিন, আমার কাছে

আসুন। ওরা নিতান্ত বালক, ওদের salvationএর কথা চিন্তা করার এখনও অনেক সময় আছে। আমি বুড়ো হয়েছি, আজ বাদে কাল মরব, আমাকে পরলোক ও salvationএর কথা বোঝান, কাজ হবে।' বৃদ্ধ হলেও, একজন ভাবী convert পাওয়া গেছে ভেবে, বাঙালী পাদ্রি সাহেব সোৎসাহে বিদ্যাসাগরের কাছে লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি অভিশাপ দিতে দিতে চলে যান।

স্বর্গলোক, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে এই ধরনের কঠোর ব্যঙ্গোক্তি বিদ্যাসাগর কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে করতেন। তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি ইহলোক ছাড়া আর কোন 'লোকে' বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তাতেও তাঁর নাস্তিকতা প্রমাণ হয় না। সারাজীবন তিনি চিঠিপত্রের শিরোনামায় 'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং', 'শ্রীশ্রীহরি শরণং' লিখেছেন। নিতান্ত লোকাচারের দাস হয়ে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এ কথা লিখেছেন, তা মনে হয় না। সুতরাং তাঁকে নাস্তিক বলা যায় না। তা হলে তিনি কি?

ইটালীয় রেনেসাঁসের নতুন মানুষের ধর্মভাব প্রসঙ্গে বুর্খার্ট লিখেছেন:[৪]

These modern men......were born with the same religious instincts as other Mediaeval Europeans. But their powerful individuality made them in religion, as in other matters, altogether subjective.

বিদ্যাসাগরের ধর্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। তাঁর

---

[৪] Jacob Burckhardt: *The Civilisation of the Renaissance in Italy*, Part VI. p. 303

ধর্ম, তাঁর ঈশ্বর, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। বাইরের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, তিনি তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বর-চেতনাকে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছিলেন। বাইরের সমাজে যখন ধর্মের নামে অধর্মের বন্যা বইছিল, তখন ধর্ম নিয়ে সামাজিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া তিনি নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করেছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন করে মানুষকে যে ধর্মের মোহমুক্ত করা যায় না, এ সত্য বাংলার বিদ্যাসাগর এ যুগের অন্যতম বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের সমসাময়িককালে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জীবনে একটিবারের জন্যও তিনি ধর্মবিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেন নি। ঘরোয়া বৈঠকেও না। নবযুগের শক্তিমান মানুষের মতন তাঁর চিন্তাধারা ছিল ইহজগৎ-কেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক। বালকদের বোধশক্তির বিকাশের জন্য যখন তিনি 'বোধোদয়' লিখেছিলেন, তখন প্রথম কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোন আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'। বালকদের সাধ্য নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেইজন্যই যে তিনি প্রথমে বোধোদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপব্যাখ্যান করতে চান নি, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু যখন করলেন তখনো দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে 'পদার্থ' বা 'Matter', তার পরে 'ঈশ্বর'। এই ইহজাগতিক মনোভাবের দিক থেকেও বিদ্যাসাগরকে রেনেসাঁস-যুগের অদ্বিতীয় মানুষ বলা যায়।

মধ্যযুগের মানুষের কুলকৌলীন্য ও স্থাবর সম্পত্তির বদলে, নবযুগের মানুষের দুটি প্রধান অবলম্বন হল—'Money' ও 'Intellect'—বিত্ত ও বিদ্যা। বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ছিল,

বিত্ত ছিল না। বিদ্যা যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সহায় হল এবং নবযুগের সমাজে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জোরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়াও সম্ভব হল (যা মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না), তখন বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময়েও সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হন নি। বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময় বলতে তাঁর চাকরির কথা বলছি না, ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসায়ের কথা বলছি। তখন ব্যবসায়বুদ্ধি প্রায় প্রত্যেক কীর্তিমান্ পুরুষের মধ্যেই প্রবল ছিল। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলে ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বাণিজ্যবুদ্ধি ও বিদ্যাবুদ্ধির এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। নবযুগের ঐতিহাসিক ধর্ম অনুযায়ীই ঘটেছিল, এবং এই দিক দিয়ে তাঁরা সত্যকারের নবযুগের মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বিদ্যা ছাড়া আর কোন পণ্যের ব্যাবসা করেন নি। পণ্যপ্রাণ যুগে, প্রাণধারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি বিদ্যাকেই পণ্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন নবযুগের প্রকৃত 'intellectual enterpreneur.' 'সংস্কৃত প্রেস' ও 'প্রেস-ডিপোজিটরি' তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীনভাবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর প্রেস পরিচালনার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিবরণটি এই :

বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন।··তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন।—তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয়

করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া, ছাপাইয়া, লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন। এই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী তাঁহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে, ইহা এখনও বর্তমান আছে,—কিন্তু উহার হিসাব রাখার নিয়ম খুব সুন্দর, যখনই যাও, আগের মাস পর্যন্ত যত বই বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই তোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে।

১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ যখন ত্যাগ করেন, তখন যে তিনি আদৌ বিচলিত হন নি তার কারণ, তখন তাঁর বই বিক্রির ব্যাবসা থেকে মাসিক আয় ছিল তিন-চার হাজার টাকা। তিনি জানতেন, অর্থসর্বস্ব এই সমাজে অর্থের জোর না থাকলে, স্বাতন্ত্র্য বা আত্মমর্যাদা রক্ষা করা কত কঠিন। তাই ১৮৪৭ সাল থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যাবসা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর প্রখর বাস্তবচেতনা ও ব্যক্তিত্ববোধ থেকেই এই আধুনিক-যুগ-সুলভ জাগতিক বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের এই material স্তম্ভটিকে মজবুত রাখবার জন্যই কোনদিন তিনি মধ্যযুগীয় বৈরাগ্য বা সাংসারিক উদাসীনতাকে প্রশ্রয় দেন নি। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর টিপিক্যাল 'নবযুগের মানুষ' ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ ভক্তি প্রীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলি নি, কারণ নবযুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার-প্রসঙ্গে তা বলবার প্রয়োজন নেই। মাইকেল মধুসূদন একবার তাঁকে বিদেশ থেকে চিঠিতে

লিখেছিলেন—'বাঙালী মায়ের মতন আপনার অন্তঃকরণ'। কিন্তু কেবল মায়ের মতন অন্তঃকরণ নিয়ে বিদ্যাসাগর 'বিদ্যাসাগর' হতে পারতেন না, যদি-না মধুসূদন-কথিত আরো দুটি গুণ তাঁর থাকত—'the genius and wisdom of an ancient Sage' এবং 'the energy of an Englishman.' কেবল প্রাচীন ঋষিদের মতন জ্ঞান ও ইংরেজের মতন কর্মশক্তি নিয়েও বিদ্যাসাগর নবযুগের অদ্বিতীয় মানুষ হতে পারতেন না, যদি-না তাঁর চরিত্রে যুগসুলভ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নবজাগরণের যুগের এই সমস্ত মহৎ গুণের সমাবেশ বিদ্যাসাগরচরিত্রে হয়েছিল বলেই, বিদ্যাসাগর বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র এমন কতকগুলি উপাদান দিয়ে গঠিত যা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কালের দূরত্ব যে কেবল তাঁর চরিত্রে বিস্ময়ের এই রং ধরিয়েছে তা নয়। কালের কাছাকাছি থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা তাঁর চরিত্রের প্রভাব অনুভব করেছেন তাঁদেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই বিস্ময়ের প্রকাশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে: "আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।...কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।" রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন: "এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের

কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ—যাহাবা কঠোব জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তূলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।” এরকম আবও অনেকের উক্তির মধ্যে বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর চরিত্রে বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণ সম্বন্ধে প্রশ্নও জেগেছে অনেকের মনে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ‘তাহা বিষম সমস্যা’ এবং ‘তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।’ বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়িয়া’ যাওয়ার মতন হয়, তাহলে তারও তাৎপর্য বোঝা দরকার অর্থাৎ কাক ও কোকিল দুই-ই চেনা দরকার। একদিকে দুর্দমতা অনম্যতা উগ্রতা রূঢ়তা বেগবত্তা সততা সত্যানুরাগ স্থিরতা ও সংযমের মতন কতকগুলি মৌলিক অথচ আপাত-বিরোধী গুণের ধারা, অন্যদিকে একজন আদর্শ ‘হিউম্যানিস্টে’র চরিত্রের উপাদানের ধারা, কেমন করে

বিদ্যাসাগর-চরিত্রে মিলিত হল, আজকে আমরা তাই নিয়ে আলোচনা করব। কারণ মানুষটাকে প্রথম চেনবার চেষ্টা না করলে, এবং তাঁর মনের গড়নটা না বুঝলে, তাঁর কাজকর্মের মূল্যবিচার করা সম্ভব নয়।

কেবল কলকাতা শহরের নতুন সামাজিক পরিবেশই বিদ্যাসাগরের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে বললে সবটুকু বলা হয় না। সবটুকু বলা তো হয়ই না, যেটুকু বলা হয় তাব মধ্যেও ফাঁক ও ফাঁকি থাকে অনেকখানি। কারণ উনিশ শতকের প্রথমভাগের কলকাতার নাগরিক পরিবেশের 'typical product' বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর তা ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের জীবন কয়েকটি পর্বে ভাগ করে, বাইরের পরিবেশের কথা চিন্তা করলে বা বিচার করলে, কথাটা আরও পরিষ্কার হবে মনে হয়। সেই পর্বগুলি এই :

১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল : আট বছর : প্রথম পর্ব, গ্রাম্য বাল্যজীবন।

১৮২৮ থেকে ১৮৪১ সাল : তেরো-চৌদ্দ বছর : দ্বিতীয় পর্ব, নাগরিক ছাত্রজীবন।

১৮৪২ থেকে ১৮৫০ সাল : আট-নয় বছর : তৃতীয় পর্ব, নগরকেন্দ্রিক কর্মজীবনের প্রস্তুতির ও সূচনার কাল।

১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ সাল : সাত বছর : চতুর্থ পর্ব, কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল।

১৮৫৯ থেকে ১৮৯১ সাল : বত্রিশ বছর : পঞ্চম পর্ব, কর্মজীবনের অপরাহ্ণকাল।

বিদ্যাসাগরের জীবনের এই বিভিন্ন পর্বের মধ্যে লক্ষণীয় হল, কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকালের সর্বাল্পতা এবং অপরাহ্ণকালের দীর্ঘস্থায়িতা। অপরাহ্ণকালকেও কয়েকটি উপপর্বে ভাগ করা

যায়, কিন্তু আপাততঃ তা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ১৮৫৮ সালের পর থেকেই যে তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় ভাঁটার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে, তা নয়। স্বাধীনভাবে অনেক কাজকর্ম তার পরেও তিনি করেছেন, সামাজিক সংস্কারকর্ম থেকে নানারকমের ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। মৃত্যুর আগের বছরেও নিজ গ্রামে বীরসিংহে মায়ের নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। দৈহিক ইঞ্জিন তাঁর বিকল ও অচল হয়ে এলেও, মনের বাষ্পীয় শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। প্রকৃত কর্মীর জীবনে তা হয়ও না। কিন্তু তা হলেও, বিদ্যাসাগরের জীবনের একটু গভীরের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত যে-ইঞ্জিন যে-শক্তির জোরে তার গন্তব্যের দিকে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছিল, হঠাৎ যেন তার পর থেকে তার বাষ্প-নিষ্কাশন শুরু হল, অদূরবর্তী 'হল্টে'র কথা মনে করে। তার পরেও সে অনেকটা পথ চলল বটে, কিন্তু সে-চলার গতি ও ভঙ্গিই আলাদা। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছরকে তাই বিদ্যাসাগরের জীবনের অপরাহ্নকাল বলেছি। আর ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সাত বছর মাত্র তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল, কারণ এই সময়েই দেখা যায়, তাঁর জীবনের পরিবেশ যেমন আবর্তসঙ্কুল, তাঁর চলার বেগও তেমনি প্রবল, এবং পদে পদে তার দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতও তেমনি তীব্র। আমরা যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের রূপায়ণের কথা বলছি তার পর্ব এখানেই শেষ হয়ে যাবার কথা। জীবনের প্রথম চল্লিশ বছরের পর চরিত্রের যে কোন পরিবর্তন হয় না তা নয়, কিন্তু সে-পরিবর্তন পশ্চিমাকাশের সূর্যের বর্ণচ্ছটার পরিবর্তনের মতন। ব্যর্থতার

বিষণ্ণতায় ও আঘাতের বেদনায় তখন রঞ্জিত হয়ে ওঠে চরিত্র, কোন নতুন রঙের পাপড়ির বিকাশ হয় না তাতে। বরং প্রস্ফুটিত চরিত্রের এক-একটি পত্র ক্রমেই বৃন্তচ্যুত হতে থাকে। বিশিষ্টতা সত্ত্বেও দেখা যায় বিদ্যাসাগব-চরিত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

১৮২০ থেকে ১৮৫৮-৫৯ সালের মধ্যেই, অর্থাৎ জীবনেব প্রথম চারটি পর্বেই, বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব রূপায়িত হয়েছে। সেই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কি? অর্থাৎ 'পার্সোনালিটি টাইপ' বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্র তার কোন্ শ্রেণীভুক্ত হবাব যোগ্য। সমাজ ও ব্যক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিসত্তার যে পূর্ণ বিকাশ হয় তাকেই আমরা বলি 'ব্যক্তিত্ব'। সাধারণ ভাষায় এই ব্যক্তিত্বই হল চরিত্র। সমাজের বহুজনস্বীকৃত ও দীর্ঘকাল প্রচলিত কয়েকটি নীতি এবং সেই নীতিনিষ্ঠ কর্ম ও আচরণ নিয়ে সামাজিক জীবন স্পন্দিত হতে থাকে। যে-কোন স্থানে ও কালে সমাজের দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কতকগুলি 'value' ও 'norm', 'গুণ' ও 'আদর্শ' এবং তাদের প্রতি সেই সমাজের মানুষের 'attitude' বা মনোভাব, এই নিয়ে সমাজ যান্ত্রিক গতিতে এগিয়ে চলে। স্বীকৃত গুণ, নীতি ও আদর্শ এবং অভ্যস্ত আচার ও আচরণের প্রতি সাধারণত মানুষের মধ্যে একটা প্রশ্নাতীত বাধ্যতার মনোভাব প্রকাশ পায়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত সাংস্কৃতিক প্যাটার্নকে বেশীর ভাগ মানুষই স্থায়ী সত্য বলে মেনে নেন। তার ফলে তাঁদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার কোন বিরোধ বা সংঘাত হয় না। সমাজের দিক থেকে 'চ্যালেঞ্জে'র আহ্বান তাঁরা শুনতে পান না বলেই তাঁদের তরফ থেকেও কোন জবাব

বা 'রেসপন্সে'র তাগিদ আসে না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যে 'ব্যক্তিত্বে'র বিকাশ হয়, মনোবিজ্ঞানীরা তাকে 'Basic Personality' বলেছেন। আমরা গড়-ব্যক্তিত্ব বা 'Average Personality' বলতে পারি। বিদ্যাসাগর-চরিত্র এই গড়-ব্যক্তিত্বের ব্যতিক্রম ও বিপরীত ছিল।

সমাজে আর একরকমের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, যাকে বিজ্ঞানীরা 'Status Personality' বলেন। ব্যক্তিত্বটা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জড়িত, এবং মর্যাদাটা একদা ছিল প্রধানত কুলকৌলীন্যের সঙ্গে, বর্তমানে বিত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একে 'Class Personality' বা শ্রেণীগত ব্যক্তিত্বও বলা যেতে পারে। যেমন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর একটা সামাজিক মর্যাদা আছে এবং ব্যক্তি হিসেবে তিনি যত নগণ্যই হন, তাঁর একটা 'Status Personality' আছে।[১]

সমাজে এও দেখা যায় যে সমমর্যাদা যাঁদের আছে বা যাঁরা একশ্রেণীভুক্ত, তাঁদের মনোভাব তো বটেই, অনেক সময় হাবভাব পর্যন্ত একরকমের হয়। ১৮৫০ সালের পর থেকে, জীবনের চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বে, বিদ্যাসাগর তখনকার সমাজে কিছুটা 'মর্যাদাসুলভ ব্যক্তিত্বে'র অধিকারী হয়েছিলেন যে, তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক সমাজের যা গড়ন, তাতে সে-মর্যাদার অধিকারী না হলে, তাঁর পক্ষে কোন কাজ করাও সম্ভব হত না। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে, বরং তাঁকে বহু কষ্ট করে, নবযুগের বিত্ত ও বিদ্যাকেন্দ্রিক সেই শ্রেণীমর্যাদা অধিকার করতে হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব কেবল শ্রেণী বা পদমর্যাদাশ্রয়ী তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়। তার প্রভাবও গভীর

১ Ralph Linton: *The Cultural Background of Personality*, Chapter V.

নয়। বিদ্যাসাগরের যে-চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কালোত্তীর্ণ হয়ে লোকচিত্তে স্থায়ী আসন দখল করে আছে তার অনেকটাই 'status-linked' বা পদ-সংশ্লিষ্ট নয়। অথচ তিনি 'Basic Personality' বা গড়-ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, সেই গড়ের গণ্ডির মধ্যেও পড়েন না। তাহলে তাঁর চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং তা বুঝতে হলে কোন্ চারিত্রিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা গ্রহণ করব, এবং কোন্‌গুলি বর্জন করব?

এই ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব-বিচার প্রসঙ্গে এযুগের একজন সংস্কৃতিবিজ্ঞানী র‍্যাল্‌ফ লিণ্টন (Ralph Linton) কয়েকটি কথা বলেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। 'ব্যক্তি' সম্বন্ধে তাঁর কথা হল :[২]

His personal predispositions will be revealed *not* by his culturally patterned responses but by his *deviations* from the culture pattern. It is not the *main theme* of his behaviour but the *overtones* which are significant for understanding him as an individual. In this fact lies the great importance of cultural studies for personality.

এই কথা বলে লিণ্টন ব্যক্তিত্ব-বিচারের যে ইঙ্গিত করেছেন তা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন:[৩]

Until the psychologist knows what the norms of behaviour imposed by a particular society are and can *discount* them as indicators of personality, he will be unable to penetrate behind the facade of social

২ Ralph Linton : *op. cit*, Chapter I

৩ Ralph Linton : *Ibid*

conformity and cultural uniformity to reach the *authentic* individual.

মানুষের আসল চরিত্র তার সমাজনির্দিষ্ট বা আদিষ্ট আচার-ব্যবহার ও ধ্যানধারণা দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ তখন সে সমাজের যান্ত্রিক 'unit' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, 'individual' বা ব্যক্তি হিসেবে নয়। তার ব্যবহার বা আচরণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও সাধারণের ব্যতিক্রম যা, তার মধ্যেই তার আসল ব্যক্তিচরিত্র ফুটে ওঠে। সমাজের বহুজনের মতন একসুরের যে ঝঙ্কার·শোনা যায় কোন ব্যক্তিব মধ্যে, তাতে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না। বেসুরো যে সব রাগ-রাগিণী ব্যক্তির জীবনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক মানুষের অন্তরালবর্তী আসল মানুষটি, লিণ্টনের ভাষায় 'the authentic individual'. বিদ্যাসাগরেব জীবনে এরকম বেসুরো রাগরাগিণীর ঝঙ্কার অনেক শোনা গেছে, এবং তার মধ্যেই 'authentic' বা আসল বিদ্যাসাগরকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, এরকম আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের দয়া বা দানের মধ্যে তাঁর আসল চরিত্রের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর দয়ার ও দানের বিশেষ পাত্র-নির্বাচনের মধ্যে। তাঁর 'উইলখানি' তার ঐতিহাসিক প্রমাণপত্র। উইলের '২৫ নং ধারা'য় তিনি তাঁর পুত্রের নাম কেন বৃত্তির তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন তা বলেছেন। অথচ উইলের মধ্যে পুত্রবধূ 'শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী'র নামে মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবীর নামে ৫৲

টাকা পর্যন্ত। আশ্রিত ও আত্মীয়স্বজনপ্রীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা তাঁর কতখানি ছিল, তা উইলের নামের তালিকা দেখেই বোঝা যায়। নিজের ভাইবোন, কন্যা, নাতিনাতনী, ভাগনে-ভাগনীরা ছাড়াও কন্যার শ্বাশুড়ী ননদরা আছেন, মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী ও বরদা দেবীর জন্য মাসিক ৩৲ টাকা ও ২৲ টাকা, মাতৃদেবীর মাতুল-দৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতার জন্য ৩৲ টাকা, পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর জন্য ৩৲ টাকা এবং আরও অনেক সুদূর আত্মীয়-আত্মীয়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যৌথপরিবারের স্বর্ণযুগেও বোধ হয় কোন পরিবার-পতি তাঁর সুবিস্তৃত দূরাত্মীয়দের সম্পর্কে এতদূর চিন্তা করতে পারেন নি। নিজের আত্মীয় ছাড়াও বন্ধুবান্ধব ও আশ্রিতদের আত্মীয়রা আছেন। যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার একদিন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন, তিনিই একদিন তাঁর কোন কৃতকর্মের জন্য বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন হন। বিদ্যাসাগর তাঁর 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' (১২৯৫ সন) গ্রন্থে স্বয়ং অনেক দুঃখে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় তাঁর উইলে তিনি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'মাতা'র জন্য মাসিক ৮৲ টাকা, 'ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী'র জন্য মাসিক ৩৲ টাকা এবং 'কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী'র জন্য মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। এইভাবে পাত্রের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের উইলের মধ্যে কোন মধ্যযুগীয় বদান্যতার একঘেয়ে সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। তাঁর দানের মধ্যেও তাঁর চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের আসল রূপটি ফুটে উঠেছে। সেই রূপ হল, ভাবালুতাশূন্য উচ্ছ্বাসবর্জিত কঠোর সংযত রূপ। তাঁর

উইল তাই সাধারণ উইলের ব্যতিক্রম, তাঁর কথাবার্তাও তাই বেসুরো। কাজকর্ম তো বটেই। এই ব্যতিক্রম ও বেসুরের মধ্যেই 'authentic' বা আসল বিদ্যাসাগর লুকিয়ে আছেন।

এই আসল বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আভাস দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়াছেন।" এই উক্তির পর স্বজাতির সাধারণ চরিত্র বর্ণনা করে তিনি বলেছেন : "আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরিপরিমাণ বাক্য-রচনা করিতে পারি তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি...।" বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন এখানে তা প্রধানত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বিদ্যাসাগর সেই সমাজ-বা-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তা থেকেও তিনি স্বশ্রেণী-চরিত্রের কলুষস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিকজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন।" মধ্যবিত্তসুলভ দৌর্বল্য ও ক্ষুদ্রতা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ত্রিসীমানায় স্থান পায় নি কখনো। হৃদয়হীনতার

অভিযোগ তাঁর শত্রুরাও কোনদিন তাঁর বিরুদ্ধে করেনি। কৃত্রিম কর্মী হিসেবে যত তিনি কর্মের দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছেন, তত নিষ্কর্মা ও অপকর্মাদের স্বাভাবিক শ্বার্তনাদ তত তীব্রতর হয়েছে। তিনি ব্যথিত হয়েছেন তার জন্য, কিন্তু বিচলিত হন নি। তাঁর মতন প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ খুব অল্প লোকেরই ছিল তখনকার সমাজে, কিন্তু কোনদিন সেই বোধ দম্ভে পরিণত হয় নি। সারশূন্য ফাঁপা তার্কিকের মতন তাঁর বাকচাতুর্যও ছিল না। 'জাতি' অর্থে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীর ইঙ্গিত করেছেন, সত্যই বিদ্যাসাগর সর্ববিষয়ে সেই বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী-চরিত্রের বিপরীত ছিলেন। শ্রেণীচরিত্র বা সাধারণ সমাজ-চরিত্র থেকে কোন ব্যক্তিচরিত্রের এই বিচ্যুতি ও বৈপরীত্যকেই লিণ্টন 'deviations from the culture-pattern' বলতে চেয়েছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন: "বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিষ, যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজা পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানব-জীবনের মহত্ত্বজ্ঞান।" শাস্ত্রীমশায়ের কথা ঠিক। চারিদিকের ক্ষুদ্রতার মধ্যেও তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে আস্থা হারান নি কোনদিন। তাঁর মতন 'হিউম্যানিস্টে'র পক্ষে তা হারানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু শাস্ত্রীমশায় আরো একটি কথা বলেছেন, যা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "বর্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি…যাহা মানব-জাতির মুখপাত্রস্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরে অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে বর্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত

উইল :ওমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন।...বর্তমানের অতৃপ্তির ন্যায়, ভবিষ্যৎ রচনার শক্তিও তাঁহার ছিল।" শাস্ত্রীমশায়ের এই উক্তি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের উৎস-সন্ধানে অনেকখানি সাহায্য করে। 'বর্তমানে অতৃপ্তি' ও 'ভবিষ্যৎ রচনা' এই দুটি কথার মধ্যেই সেই উৎস রয়েছে। লিণ্টন বলেছেন : "New Social inventions are made by those who suffer from the current conditions, not by those who profit from them." [৪] সভ্যতার ইতিহাসে এই উক্তির সত্যতা আজ স্বীকৃত। সামাজিক সঙ্কট ও সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনও এই 'invention' বা আবিষ্করণের মতন। সামাজিক আবিষ্কারক ও সংস্কারকর্মী সমপর্যায়ভুক্ত। প্রচলিত সমাজবিন্যাস ও সংস্কৃতিবিন্যাসের মধ্যে যিনি নিজেকে বেমানান বা 'misfit' মনে করেন, তার রীতিনীতি প্রথাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি যিনি বীতরাগ, তিনি তাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়বার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। শাস্ত্রীমশায়ের 'বর্তমানে অতৃপ্তি' কথার তাৎপর্য তাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে গভীর। 'বর্তমান' সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধৈর্য হারাতেন পর্যন্ত। এই 'বর্তমান' বিদ্যাসাগরের যুগের বহমান 'একাল' নয়, দোর্দণ্ডপ্রতাপে বিরাজমান 'সেকাল'। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত গড়ন-বিন্যাসের প্রতি তিনি এতদূর বীতরাগ ছিলেন যে সে-সম্বন্ধে কোন কথাবার্তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। সেকালের সমাজের প্রতি এই গভীর বীতরাগ থেকেই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব পুষ্টিলাভ করেছে। এই বীতরাগের জন্যই 'বিদ্রোহী'র একাধিক গুণের সমাবেশ হয়েছে তাঁর

৪ Ralph Linton : *op. cit*, p. 15

চরিত্রে। যেমন অনম্যতা, দুর্দমতা, অসহিষ্ণুতা, অকৃত্রিম রূঢ়তা, একগুঁয়েমি ও আপসহীনতা। কিন্তু এই বীতরাগের সঙ্গে ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে অবিচলিত বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সুন্দব ভবিষ্যতের প্রতি অনুরাগ। সেই অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হয়ে তাঁর চরিত্রের উদারতা মানবতা ও ন্যায়নিষ্ঠার বিকাশ হয়েছে। তাঁর চবিত্রে তাই লিণ্টনের ভাষায় 'overtone'-ই বেশি, চড়াসুরেই তার তারগুলি বাঁধা থাকত এবং বহুজনের একঘেয়ে সুরেব ঐকতানের মধ্যে তার বেসুরো ঝঙ্কার তাই সর্বদাই শোনা যেত।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিদ্রোহী গড়নেব খানিকটা আভাস আমরা পেয়েছি। সমকালীন সমাজের প্রতি বীতরাগই বাল্যকাল থেকে তাঁর চরিত্রকে প্রধানত রূপায়িত করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীবা বলেন, শৈশবকাল থেকেই মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে এবং শিশুর ও বালকের নানারকমের আচরণের মধ্যে সেই অতৃপ্তির ভাব প্রকাশ পায়। বাল্যকালে পারিবারিক জীবনের গণ্ডির মধ্যেই এই অতৃপ্তি প্রকাশ পেতে থাকে, এবং পরিবার যেহেতু বাইরের বৃহত্তর সমাজের 'ফ্যাক্‌সিমিলি' বা ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছু নয়, সেই হেতু এই অতৃপ্তির প্রাথমিক প্রকাশকে পরোক্ষ সামাজিক বিদ্রোহের পূর্বাভাষও বলা যায়। পরিবারের কোল থেকে বাইরের সমাজ-জীবনের প্রথম সংস্পর্শলাভের পর, বালকের সামাজিক আচরণেও এই অতৃপ্তির প্রকাশ হতে থাকে। বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেই প্রথমে তা সীমাবদ্ধ থাকে। কৈশোরে তার বিস্তার হয় আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে এবং যৌবনে সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের জীবনেও তাঁর

অতৃপ্তি বা বিদ্রোহের প্রকাশ ঠিক এইভাবে হয়েছে দেখা যায়। শৈশবকালে তাঁর জিদ্ কত প্রবল ছিল তা তাঁর পিতা-পিতামহ বলে গেছেন। বাল্যকালে তাঁর সহপাঠী ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও সংঘর্ষ বেধেছে পদে পদে, সেকথাও আমরা জানি। কৈশোরের দীর্ঘ ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার নাগরিক পরিবেশে। সে-পরিবেশে তখন নবীনের শুভাগমন হলেও, প্রাচীনের আধিপত্য তখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বে মুখর ছিল মহানগর। তারপর শুরু হয়েছে যৌবন থেকে কর্মজীবন এবং কলকাতা শহরই হয়েছে তার প্রধান কেন্দ্র। জীবনের এই প্রত্যেকটি পর্বে ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়েছে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। সংঘাত ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁর সামাজিক আদর্শও বিকাশলাভ করেছে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণও বিদ্যাসাগর-চরিত্র অনুশীলনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাঁর চরিত্রের আর একটা দিক্‌ও আছে, মূলের দিক, যে-মূল এদেশের মাটির সুদূর গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। সে-দিকটাও দেখা দরকার। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে। রামমোহন রায়ও তাই জন্মেছিলেন। দুজনেই বন্দ্যবংশীয় বা 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পরিবারের সন্তান। দুজনের জন্মস্থানের মধ্যে ব্যবধানও খুব বেশি ছিল না। দুজনেই রাঢ়ীয় কুলীন সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সেকালের রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চার গৌরবে 'অহঙ্কারে'র প্রতিমূর্তি বলে খ্যাত ছিলেন। তেজস্বিতা ছিল তাঁদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের চরিত্র এঁকে গেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন

'অহঙ্কার'। তিনি 'ভূরিশ্রেষ্ঠীবাসী ব্রাহ্মণ'। ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরশুট পরগনা একদা বর্তমান হাওড়া-হুগলী জেলার বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এখনও 'ভুবশুট' নামে একটি নগণ্য গ্রাম তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রয়েছে, হাওড়াব উত্তরে হুগলীর সীমান্তে। ভুরশুট থেকে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম সোজাপথে নদনদী পার হয়ে কুড়ি-পঁচিশ মাইলের বেশি নয়। "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের অন্যতম নায়ক ভূরিশ্রেষ্ঠবাসী এই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের নাম 'অহঙ্কাব' এবং নাটকের অপর চরিত্র কাশীবাসী ব্রাহ্মণের নাম 'দম্ভ'। দূর থেকে 'অহঙ্কার'কে আসতে দেখে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ 'দম্ভ' অনুমান করছেন যে তিনি নিশ্চয় দক্ষিণরাঢ়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দম্ভের আশ্রমে ঢুকে যথোচিত অভ্যর্থনার অভাবে রুষ্ট হয়ে 'অহঙ্কার' তাঁর শিষ্যদের বলছেন : 'ম্লেচ্ছদেশে এলাম নাকি ?' তারপর অভ্যর্থনার শেষে আত্মপবিচয় দিয়ে 'অহঙ্কার' বলছেন : 'শ্রেষ্ঠ রাজ্য গৌড়দেশ, তার মধ্যে নিরুপম প্রদেশ রাঢ়াপুরী। সেখানকার পরমসুন্দর ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরে আমার বাস। আমার পিতা সেখানকার একজন মুখ্যব্যক্তি। তাঁর মহাকুলোদ্ভব পুত্রদের এখানে কে না জানেন ? তাঁদের মধ্যে আবার প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, ধৈর্য, বিনয় ও আচারে আমিই হলাম শ্রেষ্ঠ।'

বাংলার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের চারিত্রিক গুণাবলীর কথা এখানে বিবৃত করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই সব গুণের বিস্ময়কর বিকাশ হয়েছে দেখা যায়। তিনি শিশুর মতন সহজ সরল ছিলেন, দম্ভও ছিল না তাঁর। কিন্তু তিনি 'নিরহঙ্কার' ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। অহম্-বোধ বা অহম্-চেতনার ঝঙ্কার যদি 'অহংকার' হয়, তাহলে বিদ্যাসাগরের

যে তা যথেষ্ট ছিল তা অস্বীকার করা যায় না, এবং অস্বীকার করলে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও খর্ব করা হয়। কর্মজীবনের পদে-পদে, যখনই তিনি বিদেশী ও এদেশী ফাঁকা দম্ভের প্রতিমূর্তি কোন রাজপুরুষ বা ধনী ব্যক্তির সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই তাঁর অস্থিমজ্জাগত প্রখর অহম্‌বোধ বা অহংকার আত্মপ্রকাশ করেছে। তখনই তাঁর দেশীয় ও কুলগত চারিত্রিক সদ্‌গুণের ঐতিহ্য সবলে প্রকাশ পেয়েছে। দেশীয় ও কুলগত সদ্‌গুণের এই ঐতিহ্যই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ভিত্তি। প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, বিনয়, আচার এবং অহম্‌বোধ বা অহংকার তার উপাদান। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যা কিছু মহৎ এবং নতুন নাগরিক সমাজের যা কিছু গতিশীল, তা তিনি তাঁর প্রজ্ঞাবলে সাদরে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের গঠনে তার দানও আছে। কিন্তু সে-দান পরিমিত দান। গ্রহণও তিনি নির্বিচারে করেন নি এবং যা-কিছু বর্জনীয় তাও নির্মমভাবে পরিহার করেছেন। তাই কোন আঘাতেই তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্‌ টলে ওঠে নি, উচ্ছ্বাস বা অত্যুৎসাহের দম্‌কা হাওয়ায় তিনি দোলেন নি এবং সারাজীবন তাই তিনি দেশীয় কুলগত ঐতিহ্য কতকটা জিদের বশে বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে সারল্যের চেয়ে এই ঐতিহ্যবোধ ও অহম্‌বোধই প্রকাশ পেয়েছে বেশি।

কিন্তু কৃষ্ণ মিশ্রের কালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জন্মকালের ব্যবধান অনেক। প্রায় সাত-আট-শ' বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে বাংলার সমাজে অনেক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে, সেন আমলে এবং পরবর্তী মুসলমান আমলে। নতুন নতুন প্রাণহীন কুলগত আচারের বন্ধনে সমাজ ক্রমেই নিষ্ক্রিয় ও

নিস্পন্দ হয়ে গেছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যেসব সদ্‌গুণের কথা ভূরিশ্রেষ্ঠবাসী ব্রাহ্মণ পূর্বে বর্ণনা করেছেন, তা প্রায় লোপ পেয়েছে। কুলধর্ম ও কুলকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা বদ্ধ আচারের চোরাগলিতে প্রবেশ করে, সমগ্র সমাজটাকে ভীতিপ্রদ জেলখানায় রূপান্তরিত করেছেন। কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি আচারের সুড়ঙ্গ দিয়ে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে সমাজে। সমাজের সমস্ত ক্লেদ ও মালিন্য ভেসে উঠেছে সেই বন্যার জলে। শাস্ত্রীয় আচারের নামে অকালবৈধব্য, ভ্রূণহত্যা, সতীদাহ-সহমরণ ইত্যাদির মধ্যে সমাজের বীভৎস রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। নবাবী আমল ও বৃটিশ আমলের সন্ধিক্ষণের রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলতায় এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা স্বভাবতই চরমে পৌঁছেছে। এই দুর্যোগের মধ্যে, সন্ধিক্ষণের প্রথম প্রহরে, জন্মেছেন রামমোহন, মধ্য প্রহরে বিদ্যাসাগর। দুজনেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ভূরিশ্রেষ্ঠের অনতিদূরে জন্মেছেন, তার প্রত্যক্ষ ও প্রবল প্রভাবকেন্দ্রের মধ্যে। ঘটনাটা 'অ্যাকসিডেণ্টাল-কয়েনসিডেন্স' হলেও, বিস্ময়কর 'কয়েনসিডেন্স'।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারার মধ্যে অবশ্য পার্থক্য ছিল। নবাবী আমলের পদস্থ রাজকর্মচারীদের অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন রামমোহন। ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁর পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল সেখানে। কৌলিক আচারের গতানুগতিকতায় তা বিষিয়ে ওঠে নি। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন কৌলিক সঙ্কীর্ণতার গভীর অন্ধকারের মধ্যে। তাঁর বাল্য পরিবেশে আলোর ক্ষীণ রশ্মিও ছিল না কোথাও। যজন-যাজন,

গুরুতা-অধ্যাপনার সনাতন কুলবৃত্তির শোচনীয় অর্থনৈতিক ও মর্মান্তিক সামাজিক পরিণতি তিনি নিজের পারিবারিক জীবনেই দেখেছিলেন। পিতামহ রামজয়ের পৈতৃক বাস্তু-ভিটে ত্যাগ এবং পিতা ঠাকুরদাসের কঠোর জীবনসংগ্রাম তাঁকে মিথ্যা কুলমর্যাদার মোহমুক্ত করেছিল। সংস্কৃত বিদ্যা শিখে, টোল-চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করার বাসনা ছিল ঠাকুরদাসের। সে-বাসনা চরিতার্থ হয় নি দারিদ্র্যের জন্য। কলকাতা শহরের এক শিপ্-সরকারের কাছে কাজ-চালানোর মতন সামান্য ইংরেজী শিখে, তিনি কুলবৃত্তি ত্যাগ করে জীবিকার জন্য নতুন বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক জীবনের এই ভাঙনের মধ্যে বিদ্যাসাগর সামাজিক জীবনের আরো ভয়াবহ ভাঙনের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যের বা কৌলীন্যের মর্যাদা ফাঁপা হয়ে গেছে, কারণ তার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, যদি কোন-কালে থেকে থাকে তা ভেঙে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী এক অচল সমাজব্যবস্থার মধ্যে কুলবৃত্তিগত শ্রেণীভেদের বিষময় কুফল ফলেছে। সমাজের একটা বৃহৎ শ্রেণী (ব্রাহ্মণশ্রেণী) সামাজিক উৎপাদনক্রিয়ার সঙ্গে বা সম্পদসৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ হারিয়ে অসহায় হতভাগ্য পরাশ্রিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। অথচ সমাজে ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন এই শ্রেণীরই একচেটে অধিকারভুক্ত। এই পরাশ্রিত-শ্রেণীই শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অর্থনৈতিক ভিত্তিহীন, জীবনবিচ্ছিন্ন এই ফাঁকা 'মর্যাদা' ক্রমে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীকে এক দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী শ্রেণীতে পরিণত করেছে। যে মর্যাদার আর্থিক ভিত্তি নেই, অতীতে তার কোন অর্থ থাকলেও, বর্তমানে তা অর্থহীন। তার জন্যই প্রধানত

কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার উদ্ভাবন প্রয়োজন হয়েছে, অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে। কঠোর জীবন-সংগ্রামের সমাধান করেছেন ব্রাহ্মণরা, কৌলীন্য ও অন্যান্য প্রথার আশ্রয়ে। তার অর্থনৈতিক বাস্তবতাটাই রূঢ় ও বড় সত্য, ধর্ম বা শাস্ত্র অর্ধসত্য মাত্র। বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারকর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে পরে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এই বাস্তব সত্যের কথা উল্লেখ করে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক পরিবেশে এই সত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শাস্ত্রীয় বিকৃতি ও নানাবিধ কুপ্রথাব মধ্যে তিনি সামাজিক সঙ্কটের স্বরূপ উপলব্ধি তো করেছিলেনই, তার সঙ্গে স্বশ্রেণীর বা ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর সামাজিক ক্রমাবনতি ও বিলুপ্তির রূপকল্পনাও করেছিলেন। বিদ্যাসাগবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বেব বিকাশ-প্রসঙ্গে একথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

এবাবে ব্যক্তিচরিত্রেব বিকাশের পূর্বকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ফিরে আসা যাক। লিণ্টন বলেছেন, সামাজিক পবিবর্তনে ও আবিষ্করণে তাঁরাই উৎসাহী হন যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থায় লাভবান হবেন বলে মনে করেন না। বিদ্রোহী, সংস্কারক ও আবিষ্কারক যাঁরা তাঁরা সমাজের এই স্তর থেকেই আবির্ভূত হন। এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়, কিন্তু ইতিহাসে এই নিয়মেরই অনুবর্তন দেখা যায়। এই নিয়মেই বিচার করলে, কেন আমাদের সমাজে বিদ্যাসাগরের মতন পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এবং কিভাবে তাঁর চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল, তার রহস্য অনেকটা বোঝা যায়। কেন এদেশের রক্ষণশীল কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারেই বিদ্যাসাগরের

মতন মানুষ জন্মেছিলেন, তার রহস্যও দুর্ভেদ্য মনে হয় না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাতে বিদ্যাসাগর দেশের ও জাতির কল্যাণের কোন সম্ভাবনা তো দেখেনই-নি, তাঁর নিজস্ব শ্রেণী-গত সমৃদ্ধির বা উন্নতিরও কোন সুদূর আশাও পান নি। মানুষ হিসেবে তিনি যেমন সমগ্র সমাজের সঙ্কটে বিচলিত হয়েছিলেন, তেমনি ব্রাহ্মণরূপে তিনি ব্রাহ্মণদের শ্রেণীগত সঙ্কটের গভীরতাও উপলব্ধি করেছিলেন। কুলীন ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিবেশে এই সঙ্কট আরও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। প্রচলিত প্রথা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সমগ্র সত্তা পর্যন্ত তাই বিদ্রোহ করেছিল। কেবল সামাজিক স্বার্থে নয়, কুলস্বার্থে ও শ্রেণী-স্বার্থেও। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় হল, তাঁর সমকালীন একাধিক সংস্কারকর্মী কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। রামমোহন তো ছিলেনই, 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন, বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন। এর একটা সামাজিক কারণও ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল তখনকার সমাজের প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ পরিবারে তার সঙ্কটের স্বরূপও সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছিল। সচ্ছল বিত্তশালী পরিবারে তার আর্থিক দুর্গতি চাপা থাকলেও, সেটাও ছিল অনস্বীকার্য সামাজিক সত্য। পরাশ্রিতশ্রেণী ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ও দুর্গতিও তখন চরম। বিদ্যাসাগর এই দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে সমগ্র সামাজিক সত্যটুকুও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই রামমোহনের মতন প্রধানত 'idealist' বা কৃষ্ণমোহনের মতন 'extremist' কোনটাই তিনি হতে পারেন নি। তাঁর সমকালীন সমাজকর্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সত্যকার

'realist', এবং আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের সমন্বয় তাঁর চরিত্রে যেমন ঘটেছিল, এমন আর কারো চরিত্রে বোধ হয় ঘটে নি। এই সমন্বয়ই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এই চরিত্রের রূপায়ণে তাঁর কলকাতার ছাত্রজীবনের ও কর্মজীবনের সংঘাতমুখর পরিবেশের দান অবশ্যই ছিল। তার প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু, তাঁর গ্রাম্যসমাজ, তাঁর কুলগত সদ্‌গুণের ও সদাচারের ঐতিহ্য এবং তার সমকালীন শোচনীয় দুর্গতি ও বিকৃতির পরিবেশেই তাঁর বিদ্রোহী ও বেসুরো চরিত্রের 'নিউক্লিয়াস' বা প্রাণকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। কর্মজীবনের অনেক আঘাত, অনেক বেদনা ও ব্যর্থতার মধ্যেও তাই সে-চরিত্র কেন্দ্রচ্যুত বা উন্মার্গ হয় নি।

৩ হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের সঠিক স্থান নির্দেশ করতে হলে, প্রথমে তাঁর বিদ্যানুশীলনের কথা বলা প্রয়োজন। কারণ বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার ও মাতৃ-ভাষা চর্চার একটা বিশেষ প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার কালে সকলেরই অবশ্য তাই ছিল, 'কেবলসাহিত্য' বা 'literature for literature's sake' নীতির উদ্ভব তখনও হয় নি। রাজসভার কবিরাও উদ্দেশ্য-প্রধান সাহিত্য রচনা করতেন। আদিরসাত্মক বা আধ্যাত্মিক বিষয় পরিবেশন করে, পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজড়া জমিদারদের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশের পর সাহিত্যের পোষকশ্রেণীর পরিবর্তন হল। সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সমঝদারগোষ্ঠীর পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে, আধুনিক সাহিত্যের ও মাতৃভাষার, বিশেষ করে গদ্যভাষার, ভিত্ নির্মাণ করেছিলেন যাঁরা তাঁরা তাঁদের

পোষক বা পাঠকদের 'মনোরঞ্জন' করার জন্য উদ্‌গ্রীব হন নি। সাম্প্রতিক অর্থে, 'মনোরঞ্জনে'র সমস্যাও তখন তাঁদের সামনে দেখা দেয় নি। উপন্যাস বা গল্পের মতন তার উপযুক্ত 'form' বা রূপেরই বিকাশ হয় নি তখনো। উদীয়মান মধ্যবিত্তের মনে সাহিত্যের রুচিবোধ জাগিয়ে তোলা, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আস্বাদনে তাঁদের প্রলুব্ধ করা, সাহিত্যপাঠে শিক্ষা দেওয়া এবং সাহিত্যের বিপুল সৃজনসম্ভাবনার আভাস দেওয়াই ছিল আধুনিক যুগের প্রথম সাহিত্যসাধকদের আদর্শ। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে সাহিত্যের এই আদর্শই অনুসৃত হয়েছিল এবং যাঁরা তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদেরই বলা হত 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক। সেই অর্থে, বিদ্যাসাগরকেও আমরা আমাদের দেশের একজন আদর্শ 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক বলতে পারি। না বললে, বা সেই দিক দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও বিদ্যানু-শীলনের বিচার না করলে, তাঁর প্রতি ও তৎকালের প্রতি অবিচার করা হয়।

মামুলি রীতিতে তাই বিদ্যাসাগর-সাহিত্যের বিচার না করে; ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে হবে। সকলেই জানেন, বাংলার জনসমাজে বিদ্যাসাগর 'পণ্ডিত' বলে পরিচিত ছিলেন। আজো তাঁকে 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' না বললে যেন তাঁর নামটিকে খণ্ডিত করা হল বলে মনে হয়। ইংরেজ রাজপুরুষরাও 'the Great Pundit' বলে তাঁর নামোল্লেখ করতেন। 'পণ্ডিত' যে তিনি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কি-রকমের পণ্ডিত, কোন জাতের পণ্ডিত? পণ্ডিত তাঁর পূর্বেও ছিলেন অনেকে, তাঁর সমকালেও ছিলেন, পরবর্তীকালেও হয়েছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে না হলেও, অনেকের সঙ্গে

বিদ্যাসাগরের পার্থক্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে 'পণ্ডিত' ছাড়াও আর একটি ব্যক্তির সত্তা ছিল। সেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিচার করা যায় না। এই ব্যক্তিত্বই 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিত অনেকে ছিলেন, কিন্তু এই 'হিউম্যানিস্ট' ব্যক্তিত্ব সকলের ছিল না। বিদ্যাসাগরের ছিল এবং এত বেশি পরিমাণে ছিল যে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁব ব্যক্তিত্বেব দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। হয়েছে বলেই বিদ্যাসাগরের মতন পণ্ডিত 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়' 'উপক্রমণিকা' ইত্যাদি লিখেছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনাতেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। অনেকের কাছে এটা রহস্যই বটে। বহু দুর্বোধ্য রচনাব পসরা সাজিয়ে যিনি তাঁব পাণ্ডিত্য জাহির করে সকলকে চমৎকৃত করতে পারতেন, তিনি লিখলেন 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়'। এ-রহস্য অনাবৃত করা সম্ভব নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য না বুঝলে। সেই বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নয়, 'হিউম্যানিস্টে'র পাণ্ডিত্য। এখন প্রশ্ন হল, হিউম্যানিস্ট বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যেব বৈশিষ্ট্য কি? হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত কাকে বলা হয়?

এই প্রসঙ্গে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'হিউম্যানিজম' মূলত রেনেসাঁসের জীবনদর্শন। তার দার্শনিক অর্থ প্রত্যক্ষভাবে মানবপ্রেম বা মানবতাবোধ নয়, যদিও পরোক্ষভাবে তাই। মানবপ্রধান বা মানবকেন্দ্রিক চিন্তাই হল তার ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থ। আধুনিক যুগের মানুষের নতুন চিন্তাধারার উৎস হল এই 'হিউম্যানিজম্'। মধ্যযুগের 'God-ism' বা ঈশ্বরপ্রধান চিন্তার বিপরীত এই চিন্তাধারাকে বোধ হয়

'Human-ism' না বলে কেবল 'Man-ism' বললে কোন বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকত না। এ যুগের চিন্তা প্রধানত 'anthropo-centric' বা মানবকেন্দ্রিক, সেকালের বা মধ্যযুগের চিন্তা প্রধানত 'theo-centric' বা ঈশ্বর-ও-ধর্মকেন্দ্রিক। নবযুগের এই চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনেরই নাম 'হিউম্যানিজম্', বাংলায় 'মানবমুখিনতা' বলা যায়। রেনেসাঁসের যুগের বিদ্যাচর্চার প্রেরণা ছিল এই 'হিউম্যানিজম্'। তাই 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের অধ্যাত্মবিদ্যা ও 'স্কলাস্টিসিজমে'র চর্চা না করে, ক্ল্যাসিকাল যুগের গ্রীক লাটিন বিদ্যার পুনরুজ্জীবনে মনোনিবেশ করেছিলেন। রেনেসাঁসের যুগকে তাই 'revival of learning'-এর যুগও বলা হয়। এই revival বা প্রাচীন বিদ্যার পুনঃচর্চার মূলে প্রেরণা ছিল 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের। তা যদি না থাকত, কেবল যদি তা revivalism হত, তাহলে ইতিহাসে তা 'প্রতিক্রিয়াশীল' প্রচেষ্টা বলেই নিন্দিত হত, প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত হত না। সাধারণ পণ্ডিত, মধ্যযুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আর নবযুগের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতের এই বিদ্যাদর্শের পার্থক্যটাই প্রধান। রেনেসাঁসের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সিমণ্ড্স বলেছেন :[১]

> Men found that in Classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, *by which they might profit in the present.*

ক্ল্যাসিকাল যুগে এমন এক জীবনাদর্শের সন্ধান পেল মানুষ তখন, যা অনুসরণ করে তারা বর্তমানে লাভবান হতে পারে। "By which they might profit in the present"—

১ J. A. Symonds: *A Short History of the Renaissance in Italy* (London 1893): p. 6

কথার তাৎপর্য গভীর। নবযুগের মানুষের অগ্রগতির পথে সহায় হতে পারে, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে, এমন সব নীতি ও আদর্শ হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। ক্ল্যাসিকাল যুগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিকথা, পুরাণকথা, শিল্পশাস্ত্র—সর্বক্ষেত্রে তাঁরা এই মানবমুখিন জীবনধর্মী আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, বিস্মৃতিব সমাধি থেকে তাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, এবং সেই গৌরবময় ঐতিহ্যে মানুষকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করার জন্য তার ঐকান্তিক অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। রেনেসাঁসের এই পাণ্ডিত্যের সাধনা ও বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে সিমণ্ডস বলেছেন :[২]

It was scholarship, first and last, which revealed to men the *wealth* of their own minds, the *dignity* of human thought, the *value* of human speculation, the *importance* of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas .....The Renaissance opened to the whole reading public the treasure-houses of Greek and Latin literature.

এই বিদ্যানুশীলনের ফলে মানুষের মনের সম্পদ, চিন্তার ঐশ্বর্য, কল্পনার মহত্ত্ব এবং সবার উপরে মানবজীবনের শাস্ত্রাতিরিক্ত স্বতন্ত্র মূল্যায়ন সম্বন্ধে মানুষের চেতনা জাগে, গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের লুপ্ত রত্নভাণ্ডার সকলের সামনে খুলে দেওয়া হয়। বাংলার নবজাগরণের যুগে এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যানুশীলনের ফলে, এদেশের মানুষের মনে যাঁরা এই নতুন

---

২ Symonds : *op. cit.* pp. 7-8

বিচারবোধ ও জীবনবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম তো বটেই, আমার মনে হয় 'সর্বশ্রেষ্ঠ' ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বাংলার রেনেসাঁসের দুজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মী—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার পরিবেশে মানুষ হন নি। পরবর্তীকালে সে-বিদ্যা তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় আয়ত্ত করলেও, তাঁদেব জ্ঞানবিদ্যাব ভিত্ রচিত হয়েছিল এদেশের ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যা দিয়ে। ইংরেজি শিক্ষার অনেক আগে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও এদেশের ক্ল্যাসিকাল বিদ্যায় পণ্ডিত হয়েছিলেন, ইংরেজী বা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার আগে। এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির এই পাকা-পোক্ত ক্ল্যাসিকাল বনিয়াদের জন্যই, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কেউই, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাদর্শের প্রভাবে তাঁদের উদার সমদৃষ্টি হারান নি, এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সমীকরণে ব্যর্থ হন নি। নবজাগরণের পথপ্রদর্শনে বরং তাঁরাই সবচেয়ে বেশি কৃতকার্য হয়েছিলেন। ইতিহাসের এই শিক্ষার গুরুত্ব আছে। কেবল ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শেব ফলে এদেশে নবজীবনের বা নবজাগরণের জোয়ার এসেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আংশিক সত্য মাত্র। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতন যুগনায়করা যদি প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্মৃত সম্ভার পুনরনুসন্ধান ও পুনরাবিষ্কার করে, লোকসমাজে তুলে না ধরতেন, প্রকাশ ও প্রচার না করতেন, যদি তার ভিতর থেকে নবযুগের প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রেরণা তাঁরা খুঁজে না

পেতেন, তাহলে কেবল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক পণ্ডিতদের বাণীর জাদুস্পর্শে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে নবজাগরণের এরকম আলোড়ন হত না। হলেও তা ক্ষণস্থায়ী হত এবং সমাজের উচ্চস্তরের সংকীর্ণতম গণ্ডীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত। প্রাচীন বেদ উপনিষদ পুরাণ ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যান ও প্রচার আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যতখানি সাহায্য করেছে, পাশ্চাত্ত্য মনীষী বেকন, লক্, হিউম্, টম্ পেইন, ভল্টেয়ার, ভল্নি, রুশো, কোমতের বাণী তার চেয়ে বেশি কিছু করে নি। এই সব পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের বাণী-ঘোষণা অরণ্যে-রোদনের মতন ব্যর্থ হত, যদি এদেশের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে তার পরিপোষক নীতি বা আদর্শগুলি অনুসন্ধান করে পুনরাবিষ্কার না করতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই কাজ কঠোর অনুশীলন ও অধ্যবসায় সহকারে করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা নবজাগরণের আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। সিমণ্ড্স বলেছেন :[৩]

Not only did scholarship restore classics and encourage literary criticism; it also encouraged theological criticism. In the wake of theological freedom followed a free philosophy.

রামমোহন তাঁর ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা এই 'theological criticism' বা আধ্যাত্মিক সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক বা ধর্মবিষয়ের এই স্বাধীন আলোচনা থেকেই এযুগের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার ও জীবনদর্শনের

৩ Symonds : *op. cit.* pp. 10-11

বিকাশ হয়েছিল। বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় অনুবাদ ও টীকাও করেছেন রামমোহন। বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রতিপালন করেছেন সদ্যোজাত বাংলা গদ্যভাষাকে, কারণ গদ্যভাষা মূলত—"a language of discourse"—যুক্তিতর্কই তার প্রাণ। পূর্বের সমাজে এই যুক্তিতর্কের পরিবেশই সৃষ্টি হয় নি, তার সুযোগও ছিল না তখন। নতুন সামাজিক পরিবেশে যখন যুক্তিতর্কের, বুদ্ধি-বিবেচনার অবকাশ হল, তখন কাব্যিক ছন্দোবন্ধন ছিন্ন করে, দ্রুতগতিতে বিকাশ হতে থাকল নবযুগের বন্ধনমুক্ত বলিষ্ঠ ও বেগবান বাংলা গদ্যভাষার। বাংলা গদ্যভাষায় প্রথম বেগ বলিষ্ঠতা ও যুক্তিবদ্ধতা দান করলেন রামমোহন। তারপর আরও জটিল সামাজিক আবর্তের মধ্যে বিদ্যাসাগর তার ঋজু মেরুদণ্ড ও পরিচ্ছন্ন যুক্তিবিন্যস্ত কাঠামটি গড়ে তুললেন।

হিউম্যানিস্ট পাণ্ডিত্যের স্বরূপ কি, এবং কেন বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বলা যেতে পারে, সে কথা আশা করি বলতে পেরেছি। আজকের সমাজে শুধু 'হিউম্যানিস্ট' কথার বাইরের খোলসটুকু রয়েছে, তার সারটুকু চলে গেছে। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন 'হিউম্যানিটিজ' বলতে কেবল গ্রীক-লাটিন ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা বোঝায়। সেই বিদ্যানুশীলনের মূলে যে 'হিউম্যান' বা মানবিক আদর্শের প্রেরণা ছিল, তা আর নেই। এখন শুধু ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার পণ্ডিত আছেন, 'এক্সপার্ট' বা বিশেষজ্ঞ আছেন। কোন আদর্শবাদী হিউম্যানিস্ট নেই। পেত্রার্ক, বোকাচ্চো, এরেজমুজ, চসার, কোলেট, টমাস মোরের যুগে তা ছিল না। আমাদের রেনেসাঁসের যুগেও 'পণ্ডিত' বলতে বিদ্যাসাগরের মতন হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বোঝাত। তাঁদের বিদ্যাসাধনার উদ্দেশ্য ছিল মানবমুক্তি।

এরকম দু'একজন পণ্ডিত নন, বহু পণ্ডিতের কঠোর সাধনায় মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধ-বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মানব-মনের ও মানববুদ্ধির মুক্তি সম্ভব হয়েছে। সিমণ্ড্সের ভাষায় বলা যায় :[৪]

..... scores of scholars, *men of supreme devotion* and of *mighty brain*, whose work it was to ascertain the right reading of sentences, to accentuate, to punctuate, to commit to the press, and to place beyond the reach of monkish hatred or of envious time that everlasting solace of humanity which exists in the classics......

নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় নবযুগের উষাকালে explorer-রা যেমন দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন, হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরাও তেমনি হারিয়ে-যাওয়া পুঁথিপত্রের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যকে অবিকৃত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা, তার বিকৃত টীকা-টিপ্পনি ও অপব্যাখ্যাকে বাতিল করে আসল বস্তুর পাঠোদ্ধার করা, সঠিক ব্যাখ্যা ও টীকা করা—এই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনাও প্রধানত এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পুনরুদ্ধার, টীকা-ব্যাখ্যা ছাড়াও তিনি মাতৃভাষায় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ করেছিলেন এবং তারই সার সংগ্রহ করে নবযুগের শিক্ষার উপযোগী সব পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। কেবল তাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। রামমোহনের মতন বিদ্যাসাগরও আরো দ্বিগুণ উৎসাহে, অর্জিত শাস্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সামাজিক আলোচনার

৪ Symonds : *op. cit.* pp. 9-10

ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছিলেন। তার প্রচারের জন্য নিজে ছাপাখানা স্থাপন ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। পণ্ডিত পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রবিদ্যা তিনি নির্ভয়ে জনসমাজে প্রচার করেছিলেন। এটা তার সাহিত্যকীর্তির বড় দিক।

বিদ্যাসাগরের এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যাদর্শেব কথা মনে না রাখলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। তাঁর পুঁথি-সন্ধান ও সম্পাদনা, অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সামাজিক আলোচনা মিলিয়ে তাঁর যে বিচিত্র সাহিত্য-সাধনা, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য-বিচার ও যথার্থ মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হব, তাঁর সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে। এই সাধনার ও আদর্শের সামান্য আভাস দিচ্ছি এখানে।

তাঁর সম্পাদিত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> ......manuscripts of the work are very rare...... the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence......by good fortune I procured three manuscripts from Benares ..... after carefully collating them with the texts in Calcutta ... .I have been able to edit the work.

'মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

> কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মুম্বয়ীনগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীটীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই তিনখানি ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারিপুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচিত হয়, তখন স্থির হয় যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে

এই নাটকের যে পাঠ প্রচলিত আছে তাই ছাত্রদের পাঠ্য হবে। বিদ্যাসাগরের উপর এই পাঠ রচনার ভাব দেওয়া হয়। পূর্বে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই নাটকের যে দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, তা গৌড়দেশীয় সংস্করণ। ভূমিকায় বিদ্যাসাগব এ-সম্বন্ধে লিখেছেন :

> এদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রচলিত পুস্তকেব প্রচাব নাই।… আমি কার্যবশতঃ গত ফাল্গুন মাসে বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরী নিবাসী শ্রীযুত বাবু হবিশচন্দ্রেব সহিত আমার আলাপ হয। এই মহোদয় দয়া কবিযা, স্বীয় পুস্তকালয হইতে আমায় তিনখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকৃতি দিযাছিলেন। অনন্তব, কলিকাতা সংস্কৃতবিদ্যালযের অধ্যক্ষ আমাব পবমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীব উদ্যোগে, বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয হইতেও দুইখানি মূল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক, অভিজ্ঞান শকুন্তলেব সংস্করণ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত 'হর্ষচবিতম্' গ্রন্থেব ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্যগ্রন্থ লিখিযাছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসব অতিক্রান্ত হইল, আমার পরমবন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হাবাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে একখানি পুস্তক দেখাইয়া কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রী নামে এক পণ্ডিত, পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায় আমার নিকট এই পুস্তকখানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত, ইহা বাণভট্ট প্রণীত·····। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইলাম।…কালবিলম্ব না করিয়া, নিবতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ কবিলাম।

ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্ককে 'the first of the humanists' বলে অভিনন্দিত করা হয়, কারণ সিমণ্ড্স বলেছেন :

In the susceptibility to the *melodies of rhetorical prose*,......in the passion for collecting manuscripts, and in the intuition that the future of scholarship depended upon the resuscitation of Greek studies, Petrarch initiated the......most important momenta of the Classical renaissance.

যে কয়েকটি কারণে পেত্রার্ককে নবযুগের প্রথম হিউ-ম্যানিস্ট বলা হয়েছে, ঠিক সেই সব কারণেই বিদ্যাসাগরকে বাংলাদেশের 'প্রথম' না হলেও, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বলা যায়। বিদ্যাসাগরের 'melodies of rhetorical prose' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়: "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

পেত্রার্ক, বোকাচ্চো, এরেজমুজ, এদের পুঁথিপত্র পুনরনু-সন্ধানের কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কারণ কাহিনীর গভীর তাৎপর্য জন্ অ্যাডলিংটন সিমণ্ড্স, জেকব বুর্খার্ট, হুইজিঙ্গার মতন রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকরা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের রেনেসাঁসের যুগের ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয় নি আজো, তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতন হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের দানের তাৎপর্য আজো আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি। 'হর্ষচরিতে'র পুঁথি পেয়ে বিদ্যাসাগর যখন বলেন: "কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ

করিলাম”—তখন আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না, তাঁর এত আহ্লাদ ও আগ্রহের কারণ কি, তার প্রেরণাই বা কোথায়? আরো অবাক লাগে এই কথা ভেবে যখন মনে হয়, তিনি তো কেবল বিদ্যার সাধনায় ধ্যানস্থ হতে অথবা প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে মত্ত হয়ে যেতে পারেন নি, ইয়োরোপের হিউ-ম্যানিস্টদের মতন? এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ও সামাজিক প্রথার ব্যাপক সংস্কারের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার রূপ দিয়েছেন। তার মধ্যে ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৌধনির্মাণের পরিকল্পনা ও উপকরণ সংগ্রহ কবেছেন। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগের কোন হিউম্যানিস্টের পক্ষে একাধারে এতগুলি কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয় নি। হয়ত চারশ বছর আগে, তাঁদের কালে, তা পালন করা সম্ভবও ছিল না। তা না থাকলেও, বিদ্যাসাগরের পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিল, এদেশের এত সঙ্কীর্ণ সামাজিক পরিবেশে জন্মে, সেইটাই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়।

সাহিত্য কি তা না জানলে এবং সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ না দিলে, সাহিত্যিক রুচিবোধ জাগিয়ে না তুললে, সাহিত্য-রচনার বা সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা কল্পনা করা বৃথা। মধ্যযুগের অত্যধিক আধ্যাত্মিকতার ও নীতিকথার প্রভাবে সাহিত্যের এই রসাস্বাদন ব্যাহত হত। সাহিত্য, শিল্পকলা, সবকিছুর সৌন্দর্য ছিল আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তাদের নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল গৌণ। আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ তখন ‘পাপ’ বলে গণ্য হত। এই অবস্থায় সাহিত্যের নতুন ভিত-রচনা করতে হলে, সাহিত্যের আদর্শকে প্রথমে সকলের সামনে তুলে ধরা

দরকার। বিদ্যাসাগর কয়েকটি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-দর্শন এদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত করে, সেই প্রাথমিক কর্তব্য পালন করেছিলেন। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করে, তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্ভারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রাদেশিক মাতৃভাষার সমৃদ্ধি এবং সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্যই যে বিশেষ করে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ও প্রাচীন সাহিত্যের সমুদ্র-মন্থনের প্রয়োজন, 'প্রস্তাবে'র মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করতেও তিনি ভোলেন নি। কেবল ইঙ্গিত করে বা নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। ব্যাকরণের বিভীষিকা থেকে সংস্কৃত ভাষাকে তিনি মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ছাত্রজীবনে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে তাঁর নিজেরই যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তিনি ভোলেন নি। বাংলা মাতৃভাষায় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' রচনা করে তিনি দেবভাষার গোপন চাবিকাঠিটি সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এদেশের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এত গভীরভাবে চিন্তা করেও বিদ্যাসাগর নতুন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা বিস্মৃত হন নি। অসীম আগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাই থেকে নানাবিধ রত্ন আহরণ করে 'কথামালা' 'বোধোদয়' 'জীবনচরিত' 'চরিতাবলী' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। রচনাকালে নতুন বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দও তাঁকে সন্ধান ও সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সংস্কৃত

শব্দও তিনি যথেষ্ট সংগ্রহ করেছিলেন, বাংলাভাষার পরিপুষ্টির জন্য। কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্তে 'তদ্ভব' ও 'দেশজ' শব্দের প্রয়োগের দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর 'শব্দমঞ্জরী' ও 'শব্দসংগ্রহ' নামে দুটি অভিধানের পরিকল্পনা তার সাক্ষী। দুঃখের বিষয় দুটি অভিধানের একটিও তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ-পটুতা ও যুক্তিবিন্যাস-দক্ষতার বিস্ময়কর প্রকাশ হয়েছে। গভীর হৃদয়াবেগ ও মানবিক প্রেরণার স্পর্শে তাঁর সামাজিক আলোচনা ও সমালোচনাও অনেকক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত তাঁর পরিহাস-পটুতা, প্রখর বিদ্রূপ ও শ্লেষবোধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' জনসনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্যপ্রসঙ্গে বলেছেন: "জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জন্‌সনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন।" তারপর তিনি দুঃখ করে বলেছেন: "আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না।" বিদ্যাসাগরের সামাজিক রচনা, বাদ-প্রতিবাদ, উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি পড়তে পড়তে সত্যি মনে হয়, যিনি লেখনীতে এই বিদ্রূপ শ্লেষ ও পরিহাস ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, না জানি মৌখিক ও বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় কি অজস্র ধারায় তার প্রকাশ হত। এই বিদ্রূপ ও শ্লেষের বিকাশ 'ব্যক্তিত্ব-প্রধান' সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। অর্থাৎ প্রখর ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই সমাজে ও সাহিত্যে শ্লেষ পরিহাস ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিকাশ হয়েছে। জেকব বুর্খাট তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস-গ্রন্থে 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ' প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে মধ্যযুগেও হাসি-তামাসা, বিদ্রূপ, শ্লেষ-রসিকতা সবই ছিল—'....but wit could not be an independent element in life till its appropriate victim, the *developed individual with personal pretensions*, had appeared.' মধ্যযুগেও শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কাব্য ছিল, কিন্তু সেই শ্লেষ বা বিদ্রূপের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বিশেষ হত না, কুলগত বৃত্তিগত বা জাতিগত অভিব্যক্তি হত। বুর্খাট বলেছেন :[৫]

> The middle ages are also rich in so-called satirical poems ; the satire however, is not personal, but is aimed at classes, professions, and whole populations, and it easily assumes the didactic tone.

নরযুগের সমাজে অহম্‌সর্বস্ব ব্যক্তির আবির্ভাব হল যখন, তখন তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপেরও পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। সাহিত্যেও তার প্রকাশ হল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত তার একটানা স্রোত বয়ে গেছে। এই বিদ্রূপের জোয়ারের মধ্যেই প্রথম বাংলা গল্প ও উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। প্রহসনের ভিতর দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যেরও বিকাশ হয়েছে। বাংলা আলোচনা-সাহিত্যেও যে তার তীব্র

৫ Burckhardt. *The Civilisation of the Renaissance in Italy*: p. 94, footnote 40.

দ্যুতি কি ভাবে বিকীর্ণ হয়েছে, 'বিধবাবিবাহ' 'বহুবিবাহ' ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় হল, 'বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তকে'র গোড়াতেই বিদ্যাসাগর এই নতুন ভঙ্গি ও লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন : 'এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র বিচারে এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।' কিন্তু অবগত হবার পর তিনি নিজে তাঁর পরবর্তী রচনাবলীতে, বিশেষ করে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি ছদ্মনামে রচিত গ্রন্থে, তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তিতে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা তাঁর সমকালীন গদ্য-রচনায় দুর্লভ। এই বাদ-প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে স্বভাবতই বাংলা গদ্যভাষা প্রচুর জীবনীশক্তি আহরণ করে, তাঁর হাতে সতেজ সচল ও সবল হয়ে উঠেছে এবং তার অসংযত ও অবিন্যস্ত রূপকে তিনি সংযত ও সুবিন্যস্ত করতে পেরেছেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শও হিউম্যানিস্টের আদর্শ। তিনি নিজে ছিলেন 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যার সাধক, তাই তাঁর শিক্ষার আদর্শেরও ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজ্‌ম। সেইজন্যই দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও, নবযুগের হিউম্যানিস্ট আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী করে তোলে নি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনঃচর্চার আবশ্যকতা তিনি অস্বীকার করেন নি কখনো, কিন্তু চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং নিজে তা পরিবর্তন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক এবং সেখানে অতীতের সঙ্গে কোন আপস-রক্ষা তিনি করেন নি। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় বিদ্যার সমন্বয় তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু বিদ্যার্জনের ও বিদ্যাশিক্ষার' পদ্ধতির কোনরকম মিশ্রণ কোনকালেই তাঁর

কাম্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই দিক দিয়ে মনেপ্রাণে একজন 'ইয়োরোপীয়' শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কোন ভাবের গোঁজামিল বা মনের সংশয় ছিল না। 'হিউম্যানিজম' অবশ্যই তার মূল উৎস ছিল। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে তিনি যতদূর সম্ভব এদেশের শিক্ষাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণাকেন্দ্র। শাস্ত্রকার নয়, পুরোহিত নয়, গুরু নয়, পণ্ডিত নয়, সবার উপরে 'মানুষ' গড়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুখিন শিক্ষানীতির প্রবর্তকরূপে বিদ্যাসাগর আজো শিক্ষাক্ষেত্রে 'একক' স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষায়তনকে তিনি মানবধর্মের 'নার্সারী' করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকালের চতুষ্পাঠী, আশ্রম বা সাম্প্রতিক-কালের ডিগ্রী-উৎপাদনের কারখানা করতে চান নি। তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ সত্য হয় নি, তাঁর পরিকল্পনাও অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তা সব দেশেই হয়েছে, কেবল এদেশে হয় নি। কোন দেশে কোন কালে, কোন আদর্শবাদীর স্বপ্নই বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। উনিশ শতকের অনেক আদর্শ ও স্বপ্ন যেমন আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, অবহেলিত ও বিকৃত, শিক্ষাব্রতীদের আদর্শও তেমনি অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত। কিন্তু তাই বলে তাঁদের শিক্ষাদর্শের বা শিক্ষা-পদ্ধতির কোন সামাজিক সুফল ফলে নি, এমন কথা বলা সঙ্গত নয়। গত একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে সামাজিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তা শিক্ষার প্রসার ভিন্ন হত না। উনিশ শতকের অনেক শিক্ষাব্রতী শিক্ষার এই প্রসারের কলাকৌশলের কথা চিন্তা

করেছেন। তাঁদের অনেকে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ছিলেন। বাংলাদেশে থেকেও বিদ্যাসাগর তাঁদের শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁদের চিন্তায় ও আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তার মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগ-যোগ্য, তা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সংঘাতই শিক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে তো বটেই, বিদেশী রাজপুরুষদেব সঙ্গেও। তার মধ্যেও তিনি যতটুকু শিক্ষাসংস্কার করতে পেরেছিলেন, তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্‌ও গড়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাব্রতীদের আদর্শ ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, কোথাও তা লেখা নেই। তার প্রমাণও কোন দলিলপত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কারের ধারা, রীতি ও পদ্ধতি বিচার করলেই বোঝা যায়, একশ বছর আগে হঠাৎ একদিন এসব তিনি চিন্তা করে ফেলেন নি। বিশ্বের, বিশেষ কবে ইয়োরোপের, সমকালীন শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথাও ছিল নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে? সন্ধান পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে। 'বিখ্যাত গ্রন্থাগার' বলছি, কারণ তখনকার দিনে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের আগ্রহ এবং গ্রন্থপ্রীতির আতিশয্য সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের আজো যে অবশেষ রয়েছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে', তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের

এই যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌতূহলী হয়ে এই গ্রন্থসংগ্রহ আমি নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম। দেখে, অনেক সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নানাদিক ছাড়াও, তাঁর কর্মজীবনের অনেক বিচ্ছিন্ন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর সংগৃহীত পুঁথিপত্র পুস্তকের মধ্যে। তাঁর জীবনের এই সবচেয়ে প্রিয় নিত্যসঙ্গীদের দিয়ে তাঁকে যেমন চেনা যায়, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই যায় না।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারে শিক্ষাবিষয়ে অনেক বই এখনো রয়েছে। অনেক বই নানা বিপর্যয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে, নষ্টও হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যা রয়েছে, সূত্রসন্ধানের পক্ষে তাই যথেষ্ট। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সমকালে, ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের শিক্ষাব্রতীরা যেসব শিক্ষাসমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যে পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছিলেন, বিদ্যাসাগরের সংগৃহীত পুঁথিপত্র দেখে বোঝা যায়, তার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল অন্তরের, এবং তার প্রতি তাঁর কৌতূহলও ছিল অসীম। ইংলণ্ডে এই সময় জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, মডেল স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা-নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ ও আন্দোলন চলছিল। বিদ্যাসাগর যে এই শিক্ষাসংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে খুবই ওয়াকেব্‌হাল ছিলেন, তা তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তকসংগ্রহ থেকে বোঝা যায়। ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মডেল স্কুল, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সমসাময়িক কালের বই তাঁর সংগ্রহে আছে। অকারণে অর্থব্যয় করে তিনি নিশ্চয় সেগুলি সংগ্রহ করেন নি। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে গেলেও, আজো এইসব বইয়ের 'মার্জিনে' তাঁর হাতে-লেখা 'নোট' ও চিহ্নাদি দেখে বোঝা যায়, কত

আগ্রহ নিয়ে এগুলি তিনি পড়তেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কারের ধারার সঙ্গে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবল পুঁথিপত্রের ভিতর দিয়েই এই পরিচয় ঘটে নি। এই সময় রাজকার্যে যে সব ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই নতুন শিক্ষা-দর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁদের সংস্পর্শে এসেও বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের কাজে অনেকটা উৎসাহিত হয়েছিলেন।

অনেকের ধারণা, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বেশি নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছিলেন। তা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রেও, তাঁর কালে, তিনি যে নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজকের দিনেও ভাবলে অনেকে অবাক হবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এবং 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে'র আদি রচয়িতা হয়েও, প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার যে-কোন বিভাগের যা-কিছু ভ্রান্ত সারশূন্য ও অপ্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছে, তা তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছেন সেই 'সংস্কৃত কলেজ' থেকেই তাঁর শিক্ষাসংস্কার শুরু হয়েছে। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে, সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে, তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে দাখিল করেন, এবং কলেজের অধ্যক্ষতাকালে, ১৮৫৩ সালে, বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন-রিপোর্টের উত্তরে যে সমালোচনা সংসদে পাঠান—তা বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে দুটি

যুগান্তকারী দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য। দুঃখের বিষয়, শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে বা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, বা করেছেন, তাঁরা এই দলিল দুটির আসল প্রতিপাদ্য কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান দেখা গেছে। তার কারণ তাঁদের ধারণা, বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিষয়ে যে-সব নির্ভীক মতামত এই দুটি রিপোর্টে ব্যক্ত করেছেন, তা আজো আমাদের বিদ্বৎসমাজের কাছে হয়ত 'চরম' বলে মনে হবে এবং তার প্রচাব হলে তাঁর লোকপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এ-ধারণা, আমাদের মনে হয়, ভুল। বিদ্যাসাগর চরিত্রের উপলব্ধির দিন, বা তাঁর প্রকৃত লোকপ্রিয়তার দিন, আমাদের দেশে ও সমাজে এখনো আসে নি। তাঁর চরিতকার ও তথাকথিত ভক্তবৃন্দেব বিকৃত ব্যাখ্যান ও ফিসফিসানির তলায় তাঁর প্রকৃত চরিত্র, সমাজ ও শিক্ষাবিষয়ে তাঁর আসল মতামত, আজো চাপা রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ভবিষ্যতের সমাজে, সত্যকার শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মানুষ, তাঁর চরিত্রের ও মতামতের ন্যায্য মূল্যায়নে সমর্থ হবে। তার আগে, আজকের মতন, তিনি অর্ধবিস্মৃত হয়েই থাকবেন।

দলিল দুটির কথা বলি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হবার একমাস আগে, শিক্ষাসংসদের কাছে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে পাঠ্যবস্তুর সংস্কার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করেন। যেমন ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে 'মুগ্ধবোধ' পাঠ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তা ছাড়া, 'Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries....is an imperfect grammar'. বাঙালী ছাত্ররা বাংলাভাষায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়বে এবং তার সঙ্গে সুনির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য পাঠ করিয়ে সাহিত্যবোধ

তাদের জাগাতে হবে। পরে ‘সিদ্ধান্ত কৌমুদী’ পড়বে, কারণ “of all the Sanskrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject.” এরকম সাহিত্য অলঙ্কার জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ের প্রচলিত বহু পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তিনি সমালোচনা করেছেন। সাহিত্যের পাঠ্য শ্রীহর্ষের ‘নৈষাধচরিত’ সম্বন্ধে বলেছেন—‘Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste ; there are occasional bursts, however, of fine passages.’ সুতরাং তার নির্বাচিত অংশ পড়লেই যথেষ্ট। অলঙ্কারের পাঠ্য ‘সাহিত্যদর্পণ’ ও ‘কাব্যপ্রকাশ’ সম্বন্ধে বলেছেন : “The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of Rhetoric.” সুতরাং সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যদর্শন ও রসগঙ্গাধরের বদলে কেবল ‘কাব্যপ্রকাশ’ ও ‘দশরূপক’ পাঠ্য হওয়া উচিত। জ্যোতিষ সম্বন্ধে বলেছেন : ছাত্ররা এখন ভাস্করাচার্যের ‘লীলাবতী’ ও ‘বীজগণিত’ পড়ে, কিন্তু বই দুটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথেষ্ট নয় এবং তাদের পদ্ধতিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া, অকারণে বিষয়বস্তুকে জটিলও করা হয়েছে, নিয়মকানুন প্রশ্ন সব কাব্যে লেখা হয়েছে। চার বছরে ছাত্ররা বই দু’খানি পড়ে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু শেখে না। সুতরাং জ্যোতিষশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের আগাগোড়া পরিবর্তন করতে হবে। ভাল ভাল ইংরেজী পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির

পাঠ্যপুস্তক থেকে অবিলম্বে তিনখানি পাঠ্যবই সংকলনের প্রয়োজন। এগুলি পড়বার পর ছাত্ররা লীলাবতী ও বীজগণিত পড়তে পারে। Higher Mathematics-এর বই পরে অনুবাদ করে পাঠ্যপুস্তক করতে হবে। Astronomy সম্বন্ধে, তাঁর মনে হয়, হার্শেলের বই অবলম্বন করে বাংলাভাষায় একখানি পাঠ্যপুস্তক লেখা উচিত। ইংরেজী বই পড়লেও চলত, কিন্তু বাংলাভাষায় লিখতে পারলে অন্যান্য অনেক বাংলা স্কুলেও এ-বই পাঠ্য হতে পারে। স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখেছেন : 'মনু-সংহিতা' হিন্দু বিধিবিধানের শ্রেষ্ঠ.গ্রন্থ, কারণ "It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a manner an index of Hindu Society in ancient times." সুতরাং মনু অবশ্যপাঠ্য। বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' Civil ও Criminal Law সম্বন্ধে 'is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Provinces.' তাই মিতাক্ষরাও পড়তে হবে। বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি' বিহার প্রদেশে প্রচলিত। তাও পড়া উচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' তো পড়তেই হবে। 'দত্তক মীমাংসা' ও 'দত্তক চন্দ্রিকা' দত্তক গ্রহণ ও দত্তকের অধিকারাদি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মীমাংসা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য, 'চন্দ্রিকা' বাংলাদেশের জন্য। 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' রঘুনন্দন বিরচিত, কিন্তু এর মধ্যে কেবল 'দায়' ও 'ব্যবহার' এই দুটি তত্ত্ব ছাড়া বাকি ২৬টি তত্ত্ব ধর্মানুষ্ঠানের তত্ত্বকথা। সুতরাং "the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued." কারণ "Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an

academical course.” ন্যায়শাস্ত্র প্রসঙ্গেও তিনি পাঠ্যবিষয় ও পণ্ডিতদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। ‘অনুমানচিন্তামণি’র লেখক গঙ্গেশোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলেছেন : “His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle-ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a ‘cobweb of learning’.” শ্রীহর্ষের বিখ্যাত ‘খণ্ডন’ সম্বন্ধে বলেছেন—“The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call ‘muddy metaphysics’.” অবশেষে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে ‘ন্যায়ে’র বদলে এই শ্রেণীর নাম ‘দর্শনশ্রেণী’ রাখা হোক। দর্শনবিদ্যার অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই বলে তিনি শেষ করেছেন : “True it is that the most part of the Hindu System of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanskrit Scholar their knowledge is absolutely required.” এই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে, ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে পড়বে তখন ইংরেজীও এতটা অন্তত শিখতে পারবে যাতে আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের বই পড়তে তাদের কষ্ট হবে না। তাহলে আমাদের ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনা করা বা পার্থক্য বিচার করাও তাদের পক্ষে সহজ হবে। এই সব সুশিক্ষিত ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন হিন্দু দর্শনের ভুলভ্রান্তি বা অযুক্তি প্রমাণ করা যত সহজ হবে, কেবল ইয়োরোপীয় দর্শন পাঠ করে তা সম্ভব হবে না। সবরকমের দর্শন তিনি ছাত্রদের পড়াতে চান, কারণ তা না পড়লে বিভিন্ন

মতের দার্শনিকেরা কি ভাবে পরস্পরের মতামত ও যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন, তা তারা জানতে পারবে না। তা না জানলে, কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য, আর কোন্‌টা বর্জনীয়, তাও তারা বুঝতে পারবে না। তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় দর্শনে জ্ঞান থাকলে এই বিচারবুদ্ধি তাদের আরও সজাগ হবে।

এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে এই রিপোর্টেই বিদ্যাসাগর তাঁর সুচিন্তিত মতামত নির্ভয়ে ব্যক্ত করেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনান্তে যে রিপোর্ট দেন, উত্তরের মধ্যেও বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম রিপোর্ট আর দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে তাঁর বক্তব্য স্বভাবতই আরো সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। ব্যালাণ্টাইন বিশপ বার্কলের 'Inquiry' গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে অনুমোদন করেন। বিদ্যাসাগর তা বাতিল করেন। বাতিলের পক্ষে তাঁর যুক্তি কি তা জানবার আগে, বার্কলে সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলা দরকার, কারণ বার্কলে প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশপ বার্কলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক। তাঁর মতে, বাইরের বস্তুজগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, মানসলোকে তার প্রতিফলিত রূপই 'সত্য'। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, চেতনাই সত্য। এই চেতনাই ঈশ্বর। এই ভাববাদী দর্শন শিক্ষার জন্য কোন ভারতীয়ের প্রয়োজন নেই বার্কলের কাছে দীক্ষা নেবার। ছাত্রদের তা গেলানোরও আবশ্যকতা নেই। আর তাতে কোন্‌ উদ্দেশ্যই বা সফল হবে? বিদ্যাসাগর তাই ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে লিখলেন: বার্কলের Inquiry পাঠ্য হলে সুফলের চেয়ে

কুফলের সম্ভাবনাই বেশি। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। এখানে সে-সব কারণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, সে-সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নেই। মিথ্যা হলেও অবশ্য হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতেই হবে, তখন ছাত্ররা যাতে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য ইংরেজীতে যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলে পড়িয়ে লাভ কি? বার্কলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মতন একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। ইয়োরোপেও এখন আর তা খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই বার্কলে পড়িয়ে কোন সুফল লাভের আশা নেই। এই হল বিদ্যাসাগরের যুক্তি। যেমন স্পষ্ট, তেমনি নির্ভীক। কোন ধোঁয়া নেই, বাক্‌চাতুর্যও নেই। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ যে কতখানি মানবমুখিন তা এই উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

ব্যালান্টাইন তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন : এখন এমন এক শ্রেণীর লোক গড়ে তোলার দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে, উভয় দেশের পণ্ডিতদের মতের ঐক্য খুঁজে বার করবেন, এবং ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করবেন। ব্যালান্টাইনের এ-যুক্তি যে কতখানি হাস্যকর, একটু চিন্তা করলেই তা বোঝা যায়। আসলে শিক্ষার স্বার্থে নয়, বৃটিশ শাসনের স্বার্থেই তিনি এই 'সামঞ্জস্য' স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বার্কলের দর্শন পাঠ্য করতে চাওয়ারও সেই উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজরা তখনো এদেশে প্রগতিশীল দর্শন বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে ভয় পেতেন। এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় খুব বেশি হস্তক্ষেপ করতেও

তাঁরা চাইতেন না। সেকালের পণ্ডিতগোষ্ঠীরও বিরাগভাজন হওয়া তাঁদের কাম্য ছিল না। তাই ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের হাস্যকর সামঞ্জস্যের কথাও তাঁরা কল্পনা করেছেন। কিন্তু দূরদর্শী বিদ্যাসাগরের কাছে এই ফাঁকা বুলির অযৌক্তিকতা ধরা পড়েছে। তিনি ব্যালাণ্টাইনের 'সামঞ্জস্য'-সাধন প্রস্তাবের উত্তর দিয়েছেন এই বলে : 'আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাতে পারব। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে, পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিচিত্র মনোভাব দেখা দিচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে যার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখানো বা চিন্তা করা দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের অন্ধবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। 'সবই শাস্ত্রে আছে' এই কথা ভেবে তাঁরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অতএব এই পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক তৈরি করবার কল্পনা করে লাভ নেই। তাঁদের তোষণ করার নীতিতেও কোন ফল হবে না। তাঁদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই। আজ তাঁদের মর্যাদাও লুপ্তপ্রায়, তাঁদের তম্বিগম্বিতে বা আস্ফালনে ভীত হবারও কারণ নেই। ক্রমেই তাঁদের কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। পূর্বের সামাজিক আধিপত্য তাঁরা চেষ্টা করলেও আর ফিরে পাবেন না। বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেখানেই এই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের লোকের শিক্ষার আগ্রহও আছে যথেষ্ট। সুতরাং প্রাচীনপন্থী দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা না করে, দেশের নানা স্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে অনেক বেশি কাজ হবে বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের কথা না ভেবে, এখন দেশের সাধারণ

মানুষের কথা চিন্তা করার দরকার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন একদল মানুষ গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা মাতৃভাষায় পারদর্শী হবেন, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানী ও অনুরাগী হবেন এবং সবরকমের কুসংস্কার থেকে যাঁদের মন মুক্ত হবে। এই হবে শিক্ষকের গুণ। এই ধরনের মানুষ গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর সঙ্কল্প। তার জন্য সংস্কৃত কলেজে তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োগ করবেন। কলেজের পাঠ শেষ করে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা এই ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে। তাঁর এ আশা মিথ্যা নয়।

অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই আশার কথাটা হয়ত একটু বেশি করেই বলেছিলেন। কিন্তু যে মানবিক শিক্ষাদর্শের প্রবর্তক ছিলেন তিনি, তার রূপ-কল্পনায় তখন নৈরাশ্যের স্থান ছিল না।

বাংলা শিক্ষার প্রচলন, মডেল স্কুল স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন। তার বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই এখানে। তাঁর কীর্তির এই সুদীর্ঘ ক্যাটালগ রচনা করে তাঁর শিক্ষাসংস্কারের আদর্শ বোঝানো ততটা সহজ হবে না, যতটা পূর্বোক্ত দলিল দুটির প্রতিপাদ্য প্রকাশ করলে সম্ভব হবে। জানি না, আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই দুটি বিবরণীর মতন আর কোন 'দলিল' আছে কি না— যা চিন্তায় ও পরিকল্পনায় এত গভীর ও ব্যাপক, এত বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী, এত বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত। সমাজ-সংস্কারে

যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি, তিনি সমান সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের পণ্ডিতসমাজের ভ্রূকুটির কথা ভেবে তিনি তাঁর শিক্ষাসংস্কারের সংকল্প থেকে এতটুকু বিচলিত হন নি। প্রয়োজনবোধে তাঁদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতেও বাধ্য হয়েছেন। এমনকি সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের 'ভ্রান্তি' সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাও যে তিনি কতখানি বিচার করে, যাচাই করে গ্রহণ কবার পক্ষপাতী ছিলেন, বার্কলের গ্রন্থ বাতিল করার যুক্তি থেকেই তা বোঝা যায়। ইংরেজরা সেকালের পণ্ডিতসমাজকে তোষণ করে চলতে চেয়েছিলেন, এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যা প্রগতিশীল চিন্তাধারার পোষক, তা এদেশে সহজে আমদানি করতে চান নি। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, সেকালের পণ্ডিতদের মন যুগিয়ে চলতে, বিদ্যাসাগর তা চান নি—এবং তাঁরা যা চান নি, বিদ্যাসাগর তাই চেয়েছিলেন, কেবল প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি এদেশের শিক্ষণীয় বিষয় করতে। তাও যতদূর সম্ভব মাতৃ-ভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্যে। ব্যালাণ্টাইন প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতদের মতন তাই তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন বা ঐক্যের সন্ধান থেকে বিরত ছিলেন এবং তার 'বিপদ' সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করতে ভোলেন নি। সেই বিপদ হল, 'সবই শাস্ত্রে আছে' মনে করার বিপদ, 'সবই বেদে আছে' এই মহানন্দময় চৈতন্যের সঙ্কট। বিদ্যাসাগর বলেছেন, তখনই পণ্ডিতদের মধ্যে এই চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছিল, কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে। আজো, একশ বছরের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অগ্রগতির পর, এই চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাই না কি আমরা এদেশের বিদ্বৎ-সমাজে?

বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এখনও সম্পূর্ণ জয় হয় নি, ব্যালান্টাইনদের আদর্শের প্রভাব এখনও যথেষ্ট রয়েছে। নবযুগের ইয়োরোপের 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের প্রবাহের পথ যাঁরা আমাদের দেশে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সেই ইংরেজরাই সেই আদর্শকে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের স্বার্থে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকৃত করতে কুণ্ঠিত হন নি। বিদ্যাসাগর সেই 'হিউম্যানিজমে'র আদর্শের বীজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বপন করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য সর্বপ্রথম দেশীয় বিদ্যার ঐতিহ্য থেকে এই আদর্শের পুষ্টির উপযোগী সার সংগ্রহ করার আবশ্যকতা তিনি যেমন বোধ করেছিলেন, তাঁর সমকালে আর কেউ তা করেন নি। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের চারিদিকে যুগ-যুগ ধরে গজিয়ে-ওঠা বিষাক্ত আগাছা ও আবর্জনার প্রতি, কেবল ঐতিহ্যের মোহে, তিনি আকৃষ্ট হন নি। নির্মমভাবে তা ছাঁটাই করেছেন, নির্মূল করারও চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের স্বর্ণকান্তিতে তিনি মুগ্ধ হন নি, হিউম্যানিজমের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করে, এদেশের মাটীতে 'transplant' করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের ভাষায় এই হিউম্যানিজমের মূলমন্ত্র হল—'Man is the measure of all things.' বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের একমাত্র মানদণ্ড ছিল 'মানুষ'। ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের উত্তরের উপসংহারে এই মানুষ গড়ে তোলার সঙ্কল্পই তিনি গভীর আবেগের ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

এই শিক্ষাদর্শকে বিদ্যাসাগর কিভাবে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন, সে-সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। ছাত্রদের যে তিনি ভালবাসতেন বা দরিদ্র ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য

করতেন, সেটা খুব বড় কথা নয়। ছাত্রদের তিনি 'মানুষ' বলে মনে করতেন, সেইটাই বড় কথা। সেইজন্য শিক্ষকদের সব সময় তিনি নির্দেশ দিতেন, ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করতে। তাঁর পাঠশালা-জীবন থেকে তিনি দেখেছেন, সেকালের গুরুমশায়রা ছাত্রদের প্রতি কিরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাঁর সমবয়সী বন্ধু দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা) সেকালের এই গুরুমশায়-ছাত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর 'আত্মজীবনচরিতে' লিখেছেন : "তদানীন্তন গুরুমশায়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্টি গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত।···কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্য গুরুমহাশয় কোমল ভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষা বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।···ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যম স্বরূপ জ্ঞান করিত।" বিদ্যাসাগরের কালে এই ছিল শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক। বিদ্যাসাগর এই সম্পর্ককে মানবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকদের যম না ভাবে এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রদের অসহায় জীব না ভাবেন, মানুষ বলে মনে করেন, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ছাত্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ব্যাহত করতে পারে, এরকম কোন শাস্তি বা নিষ্ঠুর আচরণের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাস শিক্ষকরা সহজে ছাড়তে পারবেন না জেনে, তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয় Metropolitan Institution-এর (শ্যামপুকুর শাখার) শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন ছাত্রদের প্রতি কোন অপমানকর ব্যবহার না করা হয়, অথবা তাদের কোনরকম দৈহিক দণ্ড না দেওয়া হয়। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে একবার ঐ বিদ্যালয়েব প্রধান শিক্ষক একটি ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিযে দেন। সেই খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ হেঁটে বিদ্যালয়ে চলে যান এবং সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান করে, প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করেন। প্রতিবেশী ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁকে সামান্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত না হতে অনুরোধ করেন। কয়েকজন শিক্ষক প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর বিচলিত না হয়ে তাঁদেরও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

ঘটনাটি এমনিতে 'লঘু ব্যাপারে গুরু সিদ্ধান্ত' বলে মনে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরেব কাছে ঘটনাটির যতখানি গুরুত্ব ছিল, ঠিক ততখানি গুরুত্বই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের দিয়েছিলেন। বিখ্যাত সুইস শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শের ফলাফল সম্বন্ধে বলা হয়: 'Perhaps a more lasting effect of Pestalozzi's teaching was the elimination of repressive discipline and cruel and degrading forms of punishment from the common schools.' বিদ্যাসাগর পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শের কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে এ-সম্বন্ধে বইও আছে। পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তখন এদেশের শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে যে

আলোচনা হত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থাগারে। কিন্তু পেস্তালৎসির কথা না জানলেও বা না শুনলেও, একথা নিশ্চয় বলা যায় যে বিদ্যাসাগরের মানবমুখিন শিক্ষাদর্শের পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় মানুষেরই মর্যাদা পেত, কলের পুতুল বলে গণ্য হত না।

৫ | বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১

সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর মানবমুখিন জীবনাদর্শের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে অন্তত তাঁর বিশ্বাস ছিল না যে পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হবেন। তাই হয়েছে, তাঁর আদর্শের সামাজিক পরীক্ষা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের মুখের দিকে চেয়ে এই ব্যর্থতার জন্য আমরা বেদনাবোধ করতে পারি, কিন্তু তবু বাস্তব সত্যের দিক থেকে এই আংশিক ব্যর্থতাকে অন্তত অস্বীকার করতে পারি না। ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ তাঁর নিজের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, বা তাঁর সহকর্মীদের যে সম্মিলিত শক্তির আঘাতে যে-সব সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশন তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন, সেই সব ইন্‌স্টিটিউশন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়মূল ও শক্তিশালী। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন গ্র্যানিট পাহাড়ের কোলে, ফুলে-ফেঁপে গর্জন করে, আছড়ে পড়ে ফিরে যায়, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলার সংস্কার-আন্দোলনের

তরঙ্গও তেমনি সমাজমানসের প্রস্তরমূলে প্রতিহত হয়ে কতকটা ভেঙে গেছে। কিন্তু একেবারে ভেঙে যায় নি।

ব্যক্তিগত জীবনের সামান্য সব অভ্যাসকর্ম মানুষ সারা-জীবনের চেষ্টাতেও অনেক সময় বদলাতে পারে না। তার স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে সেগুলি জট পাকিয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস বদলানোই যদি এত কঠিন হয়, তাহলে সামাজিক অভ্যাসকর্মের সংস্কার বা পরিবর্তন যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা এই অভ্যাসকর্মগুলিকে 'social mores' বলেন। বাংলায় সামাজিক 'নোঙর' বলা যায় এই অর্থে যে, সাধারণ মানুষেব জীবনতরী এই নোঙরে বাঁধা থাকে, তার শৃঙ্খলের সীমানার মধ্যে বদ্ধস্রোতেই তাকে ভেসে থাকতে হয়। নোঙর ছিঁড়ে দূরে ভেসে যাবার বা এগিয়ে যাবার তার উপায় নেই। কারণ এরকম একটি নোঙরে নয়, অনেক নোঙরে মানুষের সমাজ-জীবন বাঁধা থাকে। একটি যদি কোন কারণে ছিঁড়েও যায়, তাহলে হঠাৎ খানিকটা ভেসে যাওয়া তাব জন্য সম্ভব হলেও, বাকি নোঙরের টানে আবার তাকে পূর্বের গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসতে হয়। ব্যক্তির জীবনে এরকম এগিয়ে-যাওয়া ও ফিরে-আসা, অহরহ আমরা দেখতে পাই। যৌবনের ঘোর নিরীশ্বর-বাদী, প্রৌঢ়ত্বে নির্বিবাদে 'তেত্রিশ কোটি' দেবতার সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়েন। কারণ—ঐ নোঙরের টান। বাড়ন্ত জীবনের খরস্রোতে দু একটি নোঙর ছিঁড়ে যায় যখন, তখন মনে হয় সেই ছিন্ন নোঙরের মুক্ত সীমানা বুঝি আদিগন্ত। তারপর পড়ন্ত জীবনে বাকি নোঙরের টান পড়ে যখন, তখন জীবনতরী আবার তার বাঁধা ঘাটের গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসে। সমাজের জীবনেও তাই ঘটে। সমাজের বুকে নানাবিধ শক্তির

আঘাতে ও আকর্ষণে যখন খরস্রোত বইতে আরম্ভ করে, তখন সেই নতুন শক্তির প্রতিভূ যাঁরা, তাঁরা দৃঢ়মূল সব সামাজিক প্রথার নোঙর ধরে টান দেন, চেষ্টা করেন সেগুলি ছিন্ন করে সমাজ-জীবনকে স্রোতের মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে। দুচারটি নোঙর ছিন্নও তাঁরা করেন, খানিকটা এগিয়েও যায় সমাজ। কিন্তু সেই অগ্রগতি খানিকটা বা কিছু দূর পর্যন্ত সম্ভব হয়। তার তরঙ্গ ও খরস্রোতও সমাজেব একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীসীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, বিস্তৃত জনসমাজেব শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত তা পৌঁছয় না। যে সামাজিক শ্রেণী এই স্রোতের বা গতিবেগের সঞ্চাব করেন, প্রধানত সেই শ্রেণীর সীমানার মধ্যেই সামাজিক অগ্রগতি সীমাবদ্ধ থাকে। তার বাইরে বৃহত্তর সমাজের জীবন পুরনো নোঙরেই বাঁধা থাকে বলে, ঘুরে-ফিরে সমগ্র সমাজে তার পশ্চাৎ-টান অনুভব করা যায়। সমাজের বিকাশেব কাল থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতি এই ধারাতেই সম্ভব হয়েছে। এই অর্থে সামাজিক প্রগতি কোন কালে বা কোন দেশে সর্বাঙ্গীণ বা 'total' নয়, সর্বত্রই partial বা আংশিক। প্রগতি একটা বিশেষ সামাজিক স্তরের বা শ্রেণীর প্রগতি, সমগ্র সমাজের নয়। সমগ্র সমাজে তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া অবশ্য হয়, সাধারণত রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের জন্য। যেমন আধুনিক সমাজে মানুষের গণ-তান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রও ঐ সামাজিক স্তরের বা শ্রেণীর আয়ত্তে থাকে। তার বিধিবিধান সাধারণের পালনীয়, কিন্তু সমাজের অদৃশ্য ও অলিখিত প্রথানুগত বিধান তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সেখানে সমাজের ও মানুষের মন বাঁধা থাকে। আইনের জোরে মানুষের মন বদলানো যায় না। রাষ্ট্রের কাছে যা আইনসম্মত, সমাজের

কাছে তা দীর্ঘকাল 'বেআইনী' বলে গণ্য হতে পারে। যেমন, বিধবা-বিবাহ রাষ্ট্রীয় আইনের চোখে সংগত, কিন্তু সামাজিক 'আইনে' আজও সংগত নয়। এই সামাজিক আইনই 'নোওর' বা প্রথা, 'more' বা 'custom' এবং প্রথার পরমায়ু, রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ। সুতরাং সামাজিক প্রগতি, পরিবর্তন বা সংস্কার-সাধনের সার্থকতা সব সময় বিশেষ স্তরগত ও শ্রেণীগত, এবং আংশিক। এইদিক দিয়ে তার ব্যর্থতা। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আর-একদিক দিয়ে তার ঐতিহাসিক সার্থকতাও আছে। সামাজিক প্রথা ও বিধিব্যবস্থার অচলায়তনে এই শ্রেণীগত নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে মধ্যে মধ্যে যদি আঘাত না করা যেত তাহলে সমাজ-জীবনের সচলতা থাকত না। বদ্ধ অচলতায় সমাজের অপমৃত্যু ঘটত। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরেব সামাজিক সংস্কারকর্মের ব্যর্থতা ও সার্থকতা, দুইই এই দিক দিয়ে বিচার্য। ব্যর্থতার প্রমাণ প্রচুর আছে, সমাজের ভিতরে-বাইরে আজও তার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু তার সার্থকতার যুক্তি কোথায়, এবং কি কারণেই বা তা ঐতিহাসিক?

বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের ব্যর্থতার একটা বড় প্রমাণ হল তাঁর জীবনচরিতগুলি। তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রও তাঁর সামাজিক আদর্শের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর সামাজিক সংস্কার-কর্মকে কতকটা 'অপকর্ম' বলে মনে করেছেন বললেও ভুল হয় না। অথচ বিদ্যাসাগরের প্রতি বিহারীলালের ভক্তি অসীম। সেই ভক্তির প্রেরণাতেই তিনি বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মনের মতন বিদ্যাসাগরের চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে। সে-বিদ্যাসাগর দয়ালু, মহানুভব ও সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিরোধী সংস্কারের চেষ্টা তিনি এই মহানু-

ভবতার জন্যই করেছিলেন। কাজটা অন্যায়, কিন্তু 'সজ্ঞানে' অন্যায় মনে করে তিনি করেন নি। বিদ্যাসাগরের মতন অকপট-চরিত্রের মানুষ তা করতে পারেন না। এই হল বিহারীলালের বিদ্যাসাগর। সুবলচন্দ্র এরই প্রতিধ্বনি করেছেন তাঁর ইংরেজি জীবনীতে। চণ্ডীচরণ অবশ্য বিদ্যাসাগবের সামাজিক আদর্শ সমর্থন করেছেন, কিন্তু তার পক্ষে যেসব যুক্তি দিয়েছেন তা ভাবাবেগসর্বস্ব। বাল্যবৈধব্যের এত কষ্ট, বহু-বিবাহের এত কুফল, অতএব বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে নীরব থাকতে পারেন নি। অর্থাৎ 'মহানুভবতা'ই তাঁর সংস্কারকর্মের মূল উৎস, এই হল তাঁর চরিতকারদেব প্রধান বক্তব্য।

এঁদের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগব-চরিতে'র একটি কথা মনে হয়—"দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" ১৩২৯ সনের বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় আরও পরিষ্কার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন[১]. "আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়

১ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯।

যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। যারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।"

রবীন্দ্রনাথের মনে যে সত্যটি সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সেইটাই আসল সত্য। রবীন্দ্রনাথের মতন এই সত্যের দ্রষ্টা তিনিই হতে পারেন, যাঁর মন বিদ্যাসাগরের মতন কুসংস্কারের মালিন্যমুক্ত। এই সত্যটাকে কেবল তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা আজ পর্যন্ত ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে মহত্ত্বগুণে বিদ্যাসাগর দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সে-গুণ বিশ্লেষণ করে বোঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে 'বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল' বলে তাঁকে 'আধুনিক' বলা যায়, সেই কালগঙ্গার ধারা বিচার করা প্রয়োজন। তার আগে, যে-গঙ্গা মরে গেছে এবং বহমান গঙ্গা যার থেকে সরে এসেছে, সেই মরা-গঙ্গার কথাও জানা দরকার। তা না জানলে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের বা সংস্কারকর্মের সার্থকতা বোঝা সম্ভব নয়, তার সাময়িক ব্যর্থতার কথাই কেবল মনে হওয়া সম্ভব।

যে-সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আপসহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, সেই সমাজের চেহারা কি ছিল? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে-গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। মরা-হাজা নদীর খাত দেখলেই তা বোঝা যায়। মধ্যে মধ্যে তার বদ্ধ জলের ডোবা বিষাক্ত বীজাণু ছড়িয়ে পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে। বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা ঠিক এই মরা নদীর খাতের মতন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের জন্মের অনেক আগে থেকেই হতে আরম্ভ হয়েছিল। সেকালের গ্রাম্যসমাজের গড়নটাই ছিল চলৎশক্তিহীন। নড়াচড়ার সুযোগ ছিল না তার মধ্যে। সব ব্যবস্থাই তার অচল অটল, কোনটাই সচল বা গতিশীল নয়। স্তরিত পিরামিডের মতন সামাজিক শ্রেণীর গড়ন, উপর থেকে তলা পর্যন্ত থাকে-থাকে সাজানো, কোন থাক্ বা স্তরের পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ স্বোপার্জিত বিত্ত বা বিদ্যার সঙ্গে স্তরোন্নতির সম্পর্ক নেই, পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি জমিদারী ও বংশমর্যাদার ভিত্তির উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্য, পেশা, আচার, ধর্মকর্ম সব কুলগত ঐতিহ্যাধীন, ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন নয়। গ্রাম্যসমাজের এই অচলতা ও স্থিরতার সঙ্গে আধুনিক নাগরিক সমাজের গতিশীলতার তুলনা করে তাই বিখ্যাত সমাজবিদ্ সরোকিন্ বলেছেন :[২]

> The rural community is similar to calm water in a pail, and the urban community to boiling water in a kettle...Stability is the typical trait of one ; mobility is typical for the other.

২. Sorokin and Zimmerman : *Principles of Rural-Urban Sociology* (N. Y. 1929) : p 44

যে গ্রাম্যসমাজের 'typical trait'-ই হল স্থিতিশীলতা, তার স্বয়ংক্রিয় চলৎশক্তি যদি মন্থর হয়ে আসে ঐতিহাসিক কারণে, তাহলে তার যান্ত্রিক স্পন্দনটুকুও ক্রমে স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন বদ্ধ ডোবার সঙ্গে ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না।

হিন্দুযুগের শেষ পর্ব থেকে বাংলার গ্রাম্যসমাজে এই মন্থরতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেনরাজাদের সামাজিক বিধিবিধান প্রণয়ন থেকে তা বোঝা যায়। 'কৌলীন্যপ্রথা' তার মধ্যে অন্যতম। নতুন করে বিধির বন্ধন তখনই প্রয়োজন হয়, যখন সমাজের নিজস্ব বন্ধতা ভাঙতে থাকে। সেন-রাজাদেব বা কল্পিত আদিশূরের আমলের অনেক আগে থেকেই ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে বাস করছিলেন, তাঁদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল সমাজে, কিন্তু কনৌজ বা অন্য কোন স্থান থেকে খাঁটি ব্রাহ্মণ এনে তাঁদের বেদবিদ্যা বা আচার শিক্ষা দিতে হয় নি। অথবা কৌলীন্যের খুঁটি তৈরি করতে হয় নি তাঁদের মর্যাদা রক্ষার জন্য। ব্যাপারটা ভাববার মতন। বাংলার বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ এনে হঠাৎ এদেশের আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের সদাচার শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হল কেন? এদেশের ব্রাহ্মণরা আচারভ্রষ্ট হলেনই বা কেন? এই সব প্রশ্নের জন্য মনে হয়, এদেশে ব্রাহ্মণ আমদানির নানা-রকমের কাহিনী ও কিংবদন্তীর মধ্যে একটা বড় সামাজিক সত্য লুকিয়ে আছে। সেই সত্যের আনুমানিক আভাস দেওয়া যায় এইভাবে: সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির দিক থেকে ব্রাহ্মণদের নিষ্ক্রিয়তা-জনিত অবনতি ও দুর্গতি হিন্দুযুগের শেষ দিকে চরমে পৌঁছেছিল। অধ্যাপনা, শাস্ত্রবিদ্যাচর্চা, রাজমন্ত্রণা, গুরুতা প্রভৃতি কুলগত বৃত্তি ছেড়ে, ক্রমেই দারিদ্র্যের চাপে,

তাঁরা পৌরোহিত্যের দিকে ঝুঁকছিলেন এবং সেখানেও কোন বাছবিচার রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নয়, লৌকিক দেবদেবীর পূজার পুরোহিতও তাঁরা হচ্ছিলেন। এ-ছাড়া, ভিন্ন কুলের বা জাতির বৃত্তিও, জীবিকার জন্য, তাঁদের গ্রহণ করতে হচ্ছিল। এই কুলবৃত্তিচ্যুত ভাঙনোন্মুখ ব্রাহ্মণসমাজকে স্বশ্রেণীমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভাবনের। কিন্তু নতুন প্রথার জোরে ভিতরের ভাঙন রোধ করা যায় না। তার প্রমাণ, ক্রমাগত কুলভঙ্গ ও ভঙ্গকুলীনের সমস্যার মধ্যে পাওয়া যায়, বারংবার 'সমীকরণে'ও বা 'periodical classification'-এও যে-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। ভাঙন তাই ক্রমেই ব্যাপক হতে লাগল এবং কৌলীন্যেরও চরম বিকৃতি ঘটল। স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচারে পরিণত হল কৌলীন্যের অধিকার। মুসলমান অভিযানের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই ভাঙনের পথ আরো পিচ্ছিল হল, প্রধানত দুটি কারণে। একদিকে ইসলামধর্মের 'চ্যালেঞ্জ' আর-একদিকে নতুন রাজাদের পোষকতার আকর্ষণ। আর্থিক কারণেই ব্রাহ্মণরা মুসলমান-দরবারে নানা রাজকার্যে যোগ দিতে লাগলেন, কুলবৃত্তি উচ্ছন্নে যেতে লাগল। তার উপর ধর্মীয় ও সামাজিক সংকটও নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠল। বাংলার সমাজের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই ভাঙনের ছবি বৈষ্ণবসাহিত্যে, চৈতন্য-চরিত সাহিত্যে, মঙ্গলকাব্যে, সর্বত্র পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের ও সম্প্রীতির সম্পর্ক অবশ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। কিন্তু—

গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা,
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা,
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

শ্রীচৈতন্যের প্রতি কাজীর এই উক্তি যতই প্রীতিগন্ধী হোক, ব্রাহ্মণ 'নানা' ও ব্রাহ্মণ 'চাচা'-দের কুলমর্যাদা বাঁচানো সত্যিই তখন দায় হয়ে উঠেছিল। জয়ানন্দের 'ভবিষ্যদ্বাণী' ক্রমেই সত্যে পরিণত হচ্ছিল—

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে,
মোজা পায়ে নড়ি হাথে কামান ধরিবে।

চৈতন্যের যুগেই ব্রাহ্মণসন্তান 'জগাই-মাধাই' হয়েছিল। কেবল দৃষ্টান্ত হিসেবে নয়, ব্রাহ্মণ্যের পরিণতির 'symbol' হিসেবেও জগাই-মাধাই দুই ভাই উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ঘটনার এই আবর্তের মধ্যে কেবল কৌলীন্যপ্রথার জোরে কুলরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না।

কুলের ভাঙা-গড়ার মধ্যে নতুন নতুন কুল উপ-কুল ও মেলের রজ্জুবন্ধনে ক্রমেই ব্রাহ্মণসমাজের শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে ব্রাহ্মণদের এই কুল-মেল-বৈচিত্র্যের চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়:

কুলে শীলে নহে নিন্দ্য মুখটি চাটতি বন্দ্য
কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলী।
পূতিতুণ্ড বৈসে গুড রাই গাঁই কেশরী হড
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলাকুলী॥
পারিহাই পীতিতুণ্ডী ঝিকরাড়ী মালখণ্ডী
ঘোষালী বড়াল কুলমাল।
চোটখণ্ডী পলসাঁই দীর্ঘাড়ী কুসুমগাঁই
সাঁই সাঁই কুলভি পড়্যাল॥—ইত্যাদি

কুলের অন্ত নেই, দোষেরও অন্ত নেই। 'এরিথমেটিক্যাল'

গতিতে কুলবন্ধনের ফলে কতকটা যেন 'জিওমেট্রিক্যাল' গতিতে দোষবৃদ্ধি হতে থাকে। কলুদোষ, কোচদোষ, হলান্তক দোষ, হেড়া দোষ, রজক দোষ, বেড়ুয়া হাড়িদোষ, যবনদোষ, বিপর্যয় দোষ, বলাৎকার দোষ, ত্যাজ্যপুত্র দোষ, অন্যপূর্বা দোষ, কন্যাবহির্গমদোষ ইত্যাদি সামাজিক দোষের তালিকা যা কুল-গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা থেকে সামাজিক ভাঙনের চিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটকদের মধ্যে স্পষ্টবাদী ছিলেন বিখ্যাত নুলো পঞ্চানন। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কারি-কায় এই কুলবন্ধনের কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কারিকাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

চোয়ে ছোঁড়া বড দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো ব্যাটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কানা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম বঘুনাথ।
মিথিলাব পক্ষ ধরে যে করিল মাত॥
তিনজনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতিব মত নন্দা হাতে গত॥
শচী ছেলে নিমে ব্যাটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যাবে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে ক'রে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥
হাত ঘুরাইয়া বলে নুলো, আ-মরি এই কি তোমার কুল।
ছিল ঢেঁকি হল তুল আরও পরে হবে যে নির্মূল॥

তখনকার সামাজিক অবস্থাব এক অপূর্ব চিত্র মুলো পঞ্চাননের এই কারিকায় ফুটে উঠেছে।

দেখতে দেখতে আবাব সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মঘ-পর্তুগীজ দস্যুদের রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হল। কন্যাহরণও তারা কবতে লাগল এবং বাংলার ব্রাহ্মণকন্যারাও বেহাই পেলেন না। কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল, তার নাম 'মঘদোষ'। বহু কুলপঞ্জীতে—'অমুকস্য কন্যা মঘেন নীতা', 'ফিরাঙ্গি অপবাদঃ', 'ফারাঙ্গিতে নীতা মঘসংপর্কঃ' ইত্যাদি উক্তিব মধ্যে ঘটকরা অজ্ঞাতসারে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। চাবিদিকের এই দুর্যোগের মধ্যে ব্রাহ্মণসমাজের সংকট ক্রমে গভীরতর হওয়াই স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক দুর্গতিও। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে বামেশ্বর ভট্টাচার্য কুলীন ব্রাহ্মণের এই দুর্গতির চিত্র এঁকেছেন এইভাবে—

> কুলীনের পো-কে অন্য কি বলিব আমি,
> কন্যাব অশেষ দোষ ক্ষমা কবো তুমি।
> আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেটভবি ভাত—

আর ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জয়ানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী—'ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে'—অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ভালভাবে ফলতে আরম্ভ করেছিল। নবাব সরকারের চাকরি করে 'মুখ' 'বন্দ্য' প্রভৃতিরা মজুমদার সরখেল শিকদার সরকার হাজরা খাঁন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করছিলেন। অতএব, শাস্ত্রের বজ্র-আঁটুনি যে ক্রমেই ঐতিহাসিক অবস্থার আঘাতে শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শৈথিল্যজনিত ভ্রষ্টাচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 'কুলপঞ্জী' থেকেই উল্লেখ করছি। প্রধানত কুলপঞ্জী থেকে উদ্ধৃত করার কারণ, সামাজিক ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন যে পারিবারিক ইতিহাসই সামাজিক

ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকরণ এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে, বহু মিথ্যা অতিভাষণ কল্পনা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও, আমাদের কুলগ্রন্থের মধ্যে যাচাই করে গ্রহণ করতে পারলে, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। কুলগ্রন্থের সামাজিক তথ্যের কথা বলি। 'গন্ধর্ববিবাহে'র রহস্য নিয়ে ঘটকরা মনোহর কারিকা রচনা করেছিলেন অনেক। যেমন :

মহাদেবের কন্যা সে ক্ষেমা তার নাম।
গন্ধর্ব বিভা করে বন্দ্য দেবীরাম।...
রামনাথ বলে শুন অরে ভাই ক্ষেমা।
বাহির হইলে এবার রক্ষা নাই আমা॥
কৃষ্ণপ্রসাদ পুত্র ধনঞ্জয় নাম।
'রাজা রামচন্দ্র' করে ক্ষেমা ভগ্নী দান॥
পাটলি সমাজের লোক করে কানাকানি।
এক মেয়ের দুই বিভা কোথায় না শুনি॥

রাজা রামচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র রায়ের পুত্র, তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮৭-১৬৯০ সাল। এই সময় ঘটনাটি ঘটে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে।

'বাল্যবিবাহে'র বহু ভয়াবহ নিদর্শন কুলপঞ্জীতে আছে। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র সীতারামের বিবরণে পাওয়া যায় :

সীতারামস্য উচিত...বং রামানন্দ গ্রহণাৎ। অত্র প্রবন্ধেন ত্রয়োদশ দিবসীয়া কন্যা পণস্য মুদ্রা সহিত দদে, সীতারাম বলাৎকার ভয়েন স্বীকৃতং।

অর্থাৎ সীতারাম বলাৎকারের ভয়ে বন্দ্যবংশীয় রামানন্দের তেরদিনের কন্যাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন। ঘটক তাই নিয়ে কারিকা রচনা করেন :

সমানে সমান কুল ধরাধরি তায়।
লোকে বলে সীতারাম তিনশ টাকা পায়॥
দিবসে আঁধার হল পথ বেবাল চেয়ে।
সীতারাম বিহা করেন তের দিনের মেয়ে॥

এও প্রায় ১৭০০ সনের বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা।

'অন্যপূর্বা' বিবাহেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কুলপঞ্জীতে। একটির বর্ণনা দিচ্ছি। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন নীলকণ্ঠ ঠাকুরের পুত্র রামেশ্বর ঠাকুরের বিবরণে পাওয়া যায়:

রামেশ্বর ঠাকুরস্য লভ্য বং রামচন্দ্র · রামচন্দ্রস্য দৌহিত্রী নিমুনাম্নী কন্যা আর্তিপর্যায়েন শ্রীমন্তচট্টেন দস্যুতয়া গঙ্গাতীরসমীপাৎ অম্বিকাগ্রামাৎ বলাৎকারেন নীতা, রাঢ়দেশে নলাই পরগণায়াং বচ্চন্দ্রগ্রামে গুড়াপ সমীপে স্বীয়বাট্যাং স্থাপিতা। অতো বলাৎ রজনীকরী ভবানন্দমিশ্রী-দোষাণাং সম্ভবঃ। পশ্চাৎ রামেশ্বর ঠাকুরো বর্ধমানং গত্বা রাজানং নিবেদ্য নানাচেষ্টয়া তাং কন্যামানীয় সাগরদিয়া পৌত্রপর্যায় রুদ্ররাম চক্রবর্তীসুত গোবিন্দরামায় দদৌ।

এ-দেবভাষার মাতৃভাষান্তর নিষ্প্রয়োজন। ধনরত্নের মতন রমণী লুণ্ঠনের বা হরণের কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য এরকম দস্যুবৃত্তির কাহিনী শোনা যায় না। এও প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা।

'বিমাতা-বিবাহে'র কুখ্যাতি কুলীনসমাজে অনেক আগে থেকেই ছিল। বহু কুলপঞ্জীতে ও ঘটকের সরস কারিকায় তার বর্ণনা আছে। যেমন "হরি-বন্দ্যো বলে কন্যা দিল পার্বতী, হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি" ইত্যাদি। বীভৎস আচারের আরো ভয়াবহ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'মৃতকন্যাবিবাহে'র মধ্যে। ফুলিয়া মেলের কুলীন রামচন্দ্রের বিবরণে আছে: "রামচন্দ্রস্যাদৌ পিতৃবরেণ বং কামদেবস্য মৃতকন্যাগ্রহণং ইত্যাশ্চর্য্যং।" ইত্যাশ্চর্যং-ই বটে। এও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা। স্বয়ং

বিদ্যাসাগরও মনে হয় এমন আশ্চর্য তথ্যের সন্ধান পান নি। বিস্ময়কর হল, বিরলতা সত্ত্বেও, কুলপঞ্জীতেও 'বিধবাবিবাহে'র উল্লেখ আছে। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশে এই ঘটনার উল্লেখ পেলে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র অনুসন্ধানকালে নিশ্চয়ই বিস্মিত ও উৎসাহিত হতেন। গয়ঘড় বন্দ্যবংশীয় ফুলিয়া মেলের কুলীন মথুরেশের একমাত্র পুত্র রাজারাম সম্বন্ধে লিখিত আছে: "রাজারামস্য বিধবাবিবাহঃ চং রামজীবন রায়স্য কন্যা।" এও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা।[৩]

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সামাজিক জীবনের এরকম অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যায় এবং তা থেকে বোঝা যায়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সমাজের কি শোচনীয় বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছিল, জাতিগত ও কুলগত দৃঢ়বন্ধনের জন্য। সামাজিক কুলগ্রন্থে পারিবারিক কলঙ্কের কথা থাকা উচিত নয়। সুতরাং কুলগ্রন্থে, তা সত্ত্বেও যে সব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সামাজিক জীবনে তা যে আরো কত ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, তা অনুমান করা যায়। কুলাচার শেষকালে স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার কুলীন সমাজে। তার সঙ্গে আর্থিক দুর্গতিও, স্বভাবতই, ক্রমে চরম সীমায় পৌঁছেছিল। আর্থিক সংকট যত গভীর

---

৩ পরলোকগত পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে 'কুলপঞ্জী'র এই সামাজিক উপকরণগুলি আমি সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও আরো প্রচুর উপকরণ তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি যা সেকালের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য ও অমূল্য সম্পদতুল্য বলা চলে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে 'কুলগ্রন্থে'র বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণে দীনেশচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কেবল অপ্রকাশিত 'কুলগ্রন্থে'র পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর হঠাৎ-মৃত্যুর জন্য তা অসমাপ্ত থেকে গেল। —গ্রন্থকার

হচ্ছিল, সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমাজ-জীবনের নিয়মই তাই, এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম ইতিহাসে কখনো হয়েছে বলে জানা নেই। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে তার পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত আমরা চারিদিকে অহরহ দেখতে পাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বাংলাদেশের সাধারণ আর্থিক অবনতি ও গ্রাম্যসমাজের অতি-দ্রুত ভাঙনের মধ্যে পরাশ্রিত ও উৎপাদনবৃত্তিহীন ব্রাহ্মণ-সমাজের দুর্গতির আর সীমা ছিল না। একমুঠো অন্নের জন্য তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, অনেক সময় অনাহার ও অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সপরিবারে মৃত্যুবরণও করেছেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের জার্নালে, রোজনামচায় ও রিপোর্টে তার অনেক মর্মান্তিক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় কৌলীন্যের সামাজিক অধিকারকে তাঁরা ক্রমেই আর্থিক সংকট সমাধানের কাজে লাগিয়েছেন। প্রধানত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই সামাজিক প্রথাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন। 'বহুবিবাহে'র কল্পনাতীত বিস্তার তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অনুলোমপ্রথা বা Hypergamy-র জন্য কুলীনসমাজে বহু-বিবাহ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রথমে দু'চারজন স্ত্রীর মধ্যেই তা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকত। পরে যত মেলবন্ধন হয়েছে, তত সংকুচিত মেলের গণ্ডীর জন্য একস্বামীর বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। তারপর ধীরে ধীরে বিবাহটা কুলীন-ব্রাহ্মণের জাত-ব্যবসায়ে পরিণত হতে দেরি হয় নি, আর্থিক কারণে। তখন শতাধিক বিবাহ পর্যন্ত হতেও বাধা রইল না। ১৮৭১ সালে 'বহুবিবাহ' বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব রচনার সময়

বিদ্যাসাগর একটি জেলা ও একটি গ্রাম সার্ভে করে যে তথ্য-সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে দেখা যায় যে তখনো হুগলী জেলাতে ৮০টি স্ত্রীর কুলীন স্বামী ছিলেন। হুগলী জেলার জনাই গ্রাম থেকেই কেবল তিনি ৬৫ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম সংগ্রহ করেছিলেন, যাঁরা একাধিক স্ত্রীর স্বামী। তিনি লিখেছেন :

পূর্ব্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভঙ্গে সম্মত ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু অধুনাতন কুলীনেরা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এক্ষণে অধিক হইয়াছে। মূল্যও অল্প, গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এজন্য কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

বিদ্যাসাগরের নিজের রচনার মধ্যেই বহুবিবাহের অর্থ-নৈতিক কারণের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের সহায় হয়েছেন বা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এরকম কুলীন ব্রাহ্মণ কয়েকজন তাদের জীবনবৃত্তান্তে এই মর্মান্তিক সত্যকে আরো করুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুর-তারপাশার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর জীবনবৃত্তান্তে তিনি লিখেছেন[৫] :

৺পিতাঠাকুর মহাশয়, আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন—দরিদ্রতাবশতঃ আমাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয়,

৫ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত. কলিকাতা, ১৮৮১ ; ৪-৫ পৃষ্ঠা।

প্রতিকূলমতি দেখিয়া, প্রায় তিনশত টাকা ঋণভার অর্পণপূর্ব্বক আমাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার বিদ্যাবুদ্ধি অথবা এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল না যে ঐ ঋণ পরিশোধ বা পরিজন সকলের ভরণপোষণ করিতে পারি। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ছয়টি পরিণয় স্বীকার করিতে হইল, তাহাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎকালের ভরণপোষণের সংস্থান হইলে, আমি সাধারণরূপে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখা শিক্ষা করিয়া পরগণে হুশেনসাহীর জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক তহশীলদারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

চেষ্টা করলে, এরকম স্বীকারোক্তি তখনকার আরও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে 'রেকর্ড' করে রাখা যেত। যা আছে, তাও আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

বহুবিবাহের বিস্তারের 'corollary' বা প্রতিফল হল বালবিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি। কুলীনের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই সে অর্থনৈতিক বোঝা। তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রণা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলল। তখন সহমরণের শৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায়মুক্তির অপকৌশলে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরণের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোন শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। আর ক্রমবর্ধমান বালবিধবাদের মাতৃত্ব-হীনতার জন্য ক্রমেই যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণসমাজের, বিলুপ্তিও যে কিভাবে ঘনিয়ে আসছিল, তাও ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। বহুবিবাহ ও বাল্যবৈধব্য দুইই বাঙালী হিন্দুসমাজের উপরের অংশের সংখ্যাগত অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছিল। বাঙালী হিন্দুসমাজের সংখ্যাল্পতার ঐতিহাসিক কারণ এই সময়কার

সামাজিক কুপ্রথার প্রতিপত্তির মধ্যে কতটা নিহিত আছে, তাও ভাববার বিষয়।

উনিশ শতকে, সেকালের বাঙালী সমাজের সংকট ও অবনতির এই চিত্র মনে রাখলে, সমাজ-সংস্কারের ঐতিহাসিক আবশ্যকতা বোঝা সহজ হয়। বিদ্যাসাগর এই ঐতিহাসিক আবশ্যকতাবোধ থেকেই সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ্য অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, কেবল সমাজের সর্বজনের কল্যাণের স্বার্থে নয়, ব্রাহ্মণের স্বার্থেও। শ্রেণীগতভাবে বাংলার ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে যেত, কুলগত বৃত্তি ছেড়ে তাঁরা ক্রমে ভিক্ষাজীবী নিঃস্বশ্রেণীতে পরিণত হতেন, কৌলীন্য বা অনুরূপ কোন প্রথার তৃণখণ্ড ধরে তাঁরা নিশ্চিত স্বখাতসলিল-সমাধি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন না, যদি ব্রাহ্মণ-পরিবার থেকেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতন মানুষ তাঁদের মুক্তির পথের সন্ধান না দিতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের এই হল ঐতিহাসিক তাৎপর্য। নবযুগের নতুন সামাজিক পরিবেশে এই সংকট-মুক্তির যেসব ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছিল, তা তাঁরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন এবং কূপমণ্ডূক সমাজকে সেই সুযোগ ও পন্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ ব্রাহ্মণশ্রেণীর মুক্তির জন্য, সমগ্র বাঙালী সমাজ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন। এই আদর্শের সংগ্রাম বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৮২০ সালের আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। বাল্যজীবনে কৈশোরে ও যৌবনে বিদ্যাসাগর এই সংগ্রামমুখর পরিবেশে তাঁর মানসিক প্রস্তুতির অবকাশ পেয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি কোন সামাজিক সমস্যাই তাঁর

নিজের উদ্ভাবিত নয় এবং কোন সংস্কার-সংগ্রামের প্রেরণা তিনি নিজে হঠাৎ পেয়ে উৎসাহিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই তাঁর জীবনধারার মিলন হয়েছিল। এইজন্যই তিনি ছিলেন আধুনিক। যে নতুন ঐতিহাসিক খাতে, গতি-বদল করে, সমাজের জীবন-নদীর খরস্রোত বইতে আরম্ভ করেছিল, তার বিপুল প্রসারের সম্ভাবনা তিনিও তাঁর পূর্বগামীদের মতন উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদেরই নির্দেশিত পথে, ইতিহাসের গতিমুখে চলেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল। তাঁব সংস্কারকর্মেব মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যেরই স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। সেই সত্য যদি পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে থাকে, অথবা উজানমুখীরা সাময়িকভাবে জয়ী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে বলা যায় না। যে নতুন সামাজিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র এবং যে ঐতিহাসিক শক্তির প্রতিভূ ছিলেন বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে সেই শ্রেণীর ও শক্তিরই আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে ক্রমে। সমগ্র বাঙালী সমাজ সেই শক্তির টানে এবং সেই শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। এই অগ্রগতিতেই বিদ্যাসাগরের সংস্কার-সংগ্রামের সার্থকতা। তার অপূর্ণতার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার জন্য তাকে 'ব্যর্থ' বলা যায় না।

৬ | বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১

আগে আমরা বলেছি যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাংলার অন্যান্য প্রগতিশীল সমাজকর্মীরা নতুন বর্ধিষ্ণু সামাজিক শ্রেণীর মুখপাত্র এবং ঐতিহাসিক শক্তির প্রতিভূ ছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই ঐতিহাসিক শক্তির প্রেরণা এদেশে বিদেশী ইংরেজরা আমদানি করেছিলেন। সে-প্রেরণা মূলত অর্থনৈতিক। নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রেরণাও অবশ্য তার সঙ্গে ছিল। স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐতিহাসিক সুযোগ যখন এল, তখন ইংরেজের অধীনে একদল বাঙালী দালালি বেনিয়ানি মুৎসুদ্দি-গিরি করে বিত্তসঞ্চয়ে উদ্‌যোগী হলেন। সেকালের বাংলার বণিকশ্রেণী বা কারিগরশ্রেণী বলতে যাঁদের বোঝাত তাঁরা যে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, তা নয়। বরং দেখা যায়, বাণিজ্য যাঁদের কুলগত পেশা ছিল না, সেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণের লোকেরাই বেশি এই কর্মে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। তার

কারণ, কুলগত পেশার বন্ধনের যুগ, অর্থাৎ মধ্যযুগের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্ ভেঙে যাচ্ছিল। সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডও যাচ্ছিল বদলে। আগে, মধ্যযুগের সমাজে মর্যাদা ছিল প্রধানত কুলগত—নবযুগের সমাজে মর্যাদা হল স্বোপার্জিত বিত্তগত। এই বিত্ত যে-কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে অর্জন করা যায়, এমন কি বিদ্যাবৃত্তিও। অর্থাৎ বিদ্যাও অন্যান্য পণ্যের মতন বাজারে কেনাবেচা করা যায়, এবং নবযুগের বিদ্যা এমনই এক বস্তু যা যতই দান করা যায় ততই যে নিজে বেড়ে যায় তা নয়, বিত্তও বাড়ায়। বাণিজ্যের মুনাফালব্ধ বিত্ত এবং বিদ্যার্জিত বিত্ত, নতুন সমাজে দুয়েরই মর্যাদা এক। ব্রাহ্মণ-সন্তান এখন বাণিজ্য করে বিত্তবান হতে পারেন, এবং বণিকের সন্তান বিদ্যাচর্চা করে বিত্তশালী পণ্ডিত হতে পারেন। কারো সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথে কোন বাধা নেই। বিত্তসঞ্চয়ে সক্ষম হলে দুজনেই সমান মর্যাদা পাবেন সমাজেব কাছে, যা মধ্যযুগে পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। 'Money' বা টাকার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেই আধুনিক যুগে 'Intellect' বা বিদ্যার মর্যাদা স্বীকৃত হল। সামাজিক মর্যাদার নতুন স্তম্ভ হল দুটি—বিত্ত ও বিদ্যা—তার মধ্যে বিত্তেব স্তম্ভই বেশি মজবুত। বিত্তের মর্যাদা মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু ব্যক্তিসামর্থ্যের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। আধুনিক যুগে এই 'personal achievement' বা ব্যক্তিসামর্থ্যই বিত্ত ও বিদ্যা উভয়ক্ষেত্রে স্বীকৃত হল। এইভাবে অবাধ বাণিজ্যে মুনাফা সঞ্চয় করে যাঁরা বিত্তশালী হলেন, তাঁদের সমাজশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় 'বুর্জোয়াশ্রেণী', এবং বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জনে সফল হলেন তাঁদের বলা হয় 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণী' (Intelligentsia)। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে

(যে সন্ধিক্ষণকে 'রেনেসাঁসের যুগ' বলা হয়) এইভাবে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে পূর্বের সামন্ত-ও-পুরোহিত-প্রধান সমাজের গড়ন ভাঙতে লাগল। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড ফন্ মার্টিন এই সামাজিক বিকাশ সম্বন্ধে বলেছেন :[১]

We find arising against the privileged clergy and the feudal nobility the bourgeoisie, which was throwing off their tutelage and emerging on the twin props of money and intellect as a bourgeoisie of 'liberal' character.

আমাদের দেশে, এমন কি ইয়োরোপেও, এই নতুন সামাজিক শ্রেণীকে সাধারণভাবে 'নবযুগের মধ্যবিত্তশ্রেণী' বলা যায়। বিত্তবান ও বিদ্বান সকলেই মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সত্যিকার 'ক্যাপিটালিস্ট'-শ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে বলে নতুন যে-শ্রেণী এখানে নবযুগের আদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছেন, তাঁদের 'মধ্যবিত্ত' বলা যেতে পারে। ইয়োরোপেও নতুন শিল্পবাণিজ্যের বিকাশের যুগে, এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এবং রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের আদর্শ তাঁরাই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে পোলার্ড বলেছেন :[২]

The industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide ; it requires a middle class and it requires an urban population. Without these two there would

১ A. V. Martin : *Sociology of the Renaissance* : Introduction.

২ A. F. Pollard : *Factors in Modern History* : p. 43

have been little to distinguish between modern from mediaeval history. Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation.

এই কথা বলে, পোলার্ড ইংল্যণ্ড সম্বন্ধে বলেছেন :

England...has been for centuries peculiarly the land of the middle classes; they give the tone to everything English, good or bad, and English history has been made by its middle class to a greater extent than the history of any other country.

পোলার্ডের কথা একদিক থেকে সত্য, আর-একদিক থেকে কিছুটা পরিপূরণীয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে সেখানে নতুন নাগরিক মধ্যবিত্তের দ্রুত বিকাশের সুযোগ হয়েছে যেমন, তেমনি সেকালের লর্ড-বেরন-ডিউকশ্রেণী এবং নতুন শিল্পপতি-শ্রেণীর প্রতিপত্তিও কম বাড়ে নি। মধ্যবিত্তের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তাঁদের প্রভাব বেড়েছে, এবং তাঁদের আদর্শের সংগ্রামে তাঁরা জয়ীও হয়েছেন। বাংলাদেশে অবশ্য পোলার্ডের এই 'middle-class England'-এর প্রভাব গভীরভাবেই পড়েছে এবং বাংলাদেশকেও পোলার্ডের ভাষায়, কিছুটা ভিন্ন অর্থে অবশ্য, 'peculiarly a land of the middle-classes' বলা যায়। কিছুটা ভিন্ন অর্থে কারণ, বাংলাদেশে শিল্পবিপ্লব বা শিল্পপতিশ্রেণীর বিকাশ হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর রামমোহনের যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৩০ সালের মধ্যে, যে-শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্যমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তাঁরা সঞ্চিত মূলধন শিল্পক্ষেত্রে

নিয়োগ না করে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঐতিহাসিক সুযোগে নতুন এক জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের বংশধবরাই আধুনিক বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ। বাকি অংশ বিদ্যাবুদ্ধিজীবী ও চাকুরিজীবী। বাংলাদেশে নবযুগের রেনেসাঁসের প্রবর্তক এই নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী।

পোলার্ড নগরজীবীশ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী, দুই শ্রেণীর কথা বলেছেন। এক কথায় বলা যায়, নাগরিক মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের উদ্যোক্তা। মধ্যযুগে গ্রাম ছিল জীবনের কেন্দ্র, কারণ জমিজমাই ছিল জীবনের অচল সম্পদ। আধুনিক যুগে নগর ও শহরই হল জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র, কারণ আধুনিক যুগের সচল বিত্ত বা ঘূর্ণায়মান টাকাই হল জীবনীশক্তি এবং তার অফুরন্ত ও পরিবর্তনশীল উৎস হল শহর নগর। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন্ বলেছেন :[৩]

All the institutions which serve as channels of the vertical circulation (social promotion and demotion) of individuals in a society—the universities, churches, centres of financial and economic power, army headquarters, centres of political power, headquarters of arts, sciences, literature, parliaments, influential newspapers, emperor courts and other 'social elevators' are located in cities, not in the country.

সরোকিনের এই উক্তির মধ্যে 'vertical circulation' এবং 'social elevators' কথা দুটি লক্ষণীয়। সমাজের vertical বা উল্লম্ব গভীরতা (অর্থাৎ উপরের শ্রেণী থেকে

৩ Sorokin and Zimmerman: *Principles of Rural-Urban Sociology*: p. 41

নীচের শ্রেণীর দূরত্ব) বাড়ে শ্রেণীবিন্যাসের প্রসারের জন্য। বিভিন্ন শ্রেণীর ওঠানামার গতিবেগও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। আজকের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুযোগ পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষপতি ধনিক হতে পারেন। আবার ধনিকের পক্ষে অবস্থা-চক্রে দরিদ্র মধ্যবিত্তের স্তরে নেমে আসতেও বাধা নেই। এই সামাজিক স্তরগত বা শ্রেণীগত উত্থান-পতনই 'vertical circulation' এবং এর বেগ আধুনিক যুগেই সবচেয়ে প্রবল। মধ্যযুগে এর বালাই ছিল না, কারণ তখন তো সবই 'fixed' ছিল, শ্রেণী বা স্তরও নির্দিষ্ট ছিল। স্তরান্তরের কোন সুযোগই ছিল না, কারণ 'social elevator' তখন বিশেষ কিছু ছিল না। শাস্ত্রীয় বচনেই সব নির্ধারিত হত। সামাজিক উন্নতির মই বা সোপান বলে কিছু ছিল না। আধুনিক যুগে এই সোপানের সংখ্যা অনেক, এবং তার সবগুলিরই হেডকোয়ার্টার শহরে। সুদূর গ্রামের দরিদ্র কৃষকও এ-সত্য জানে, তাই তার সন্তান ঐ সোপান ধরে উপরে ওঠার আশায় শহরে আসে। শহরে না এলে জীবনের সম্মুখ-গতির কোন সম্ভাবনা নেই, অবশ্য অধোগতিরও। গতিটাই বা 'mobility'-টাই এখানে মুখ্য সত্য, অগ্র-পশ্চাতেব প্রশ্ন গৌণ। আধুনিক যুগের সূচনা থেকেই তাই বাংলাদেশের নব-জীবনের হেডকোয়ার্টার হল কলকাতা শহর। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই তার ধীরে ধীরে বিকাশ হল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশের দ্রুততা বাড়ল। সরোকিন যে-সব সামাজিক 'elevator'-এর নাম করেছেন—বিদ্যায়তন, য়ুনিভার্সিটি, আপিস-আদালত, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প-কলা, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র—তার সবগুলির প্রতিষ্ঠা হল কলকাতা শহরে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের লোকসংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকল।

পোলার্ডের নগরজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীরও কলেবর স্ফীত হল কলকাতায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকে, দ্রুত গতিতে। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হল। স্বভাবতই তার প্রধান ক্ষেত্র হল কলকাতা শহর।

এই প্রধান ক্ষেত্র কলকাতা শহর থেকে, বাংলাদেশের রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন আন্দোলনের আদিকল্পক ও প্রবর্তক রামমোহন রায় যতদিন দূরে ছিলেন, ততদিন তাঁর কোন চিন্তা ও পরিকল্পনাকেই তিনি বাস্তব রূপ দেবার সুযোগ পান নি। জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর, ১৭৭৪ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত, নানা কাজে তাঁর কলকাতার বাইরেই কেটেছে। তার মধ্যে অবসর সময়ে লেখাপড়ার চর্চা করা এবং ফারসীতে 'তুহফাৎ' লেখা ছাড়া, অধিকাংশ সময় তিনি অর্থোপার্জনের কাজেই কাটিয়েছেন। কলকাতা শহরে এসে, প্রথমেই তিনি চৌরঙ্গীতে ও মানিকতলায় দুই সাহেবের দুখানি বাড়ি কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। শহরের নতুন প্রতিপত্তিশালী সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে তখন এই প্রতিষ্ঠা দেখানোর প্রয়োজন ছিল। আরামবাগের রাধানগর গ্রামে তাঁর যতটা পারিবারিক বা কৌলিক প্রতিষ্ঠাই থাকুক না কেন, নতুন নাগরিক সমাজে তখন আর তার কোন প্রভাব বিশেষ ছিল না। অথচ তখনকার প্রভাবশালী নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠা না পেলে, সংস্কারকর্মের কোন পরিকল্পনাই যে তাঁর সার্থক হবে না, তা তিনি জানতেন। স্বোপার্জিত বিত্ত ও বিদ্যার সাহায্যে সেই প্রতিষ্ঠা তিনি সহজেই পেলেন এবং ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র অনুবাদ প্রকাশ এবং 'আত্মীয় সভা' স্থাপন থেকেই তাঁর 'রিফর্মেশনে'র কাজ শুরু হল।

রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র সভ্যবৃন্দের মধ্যে সকলেই তখনকার শহুরে সমাজের রীতিমত গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর, তাঁর পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদাব কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোব বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসেব রাজা, আন্দুলের বাজা, জাস্টিস অনুকূলচন্দ্রের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানরাজের আত্মীয়, নিমকমহলের দেওয়ান মোতিচাঁদ এবং আবো অনেকে। নতুন বিত্তবান শ্রেণীর অনেকেই রামমোহনের অনুগামী, অর্থাৎ রিফর্মেশনেব সমর্থক ছিলেন। এই বিচিত্র শ্রেণী-সমাবেশেব ঐতিহাসিক গুরুত্ব লক্ষণীয়। বাজা-মহারাজা-জমিদার যাঁরা তাঁরা সেকালের 'feudal nobility' ঠিক নন, সকলেই প্রায় শহরবাসী, গ্রাম বা জমিদারীব প্রতি আন্তরিক মমতা কাবো নেই, কেবল অর্থ পেলেই হল, কনট্র্যাকটারের ব্যবসায়ের মতন। তাঁরা উদীয়মান বণিকদের মিত্র, এবং শ্রেণীগতভাবে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির বাসনা উভয়েরই সমান। তাই তাঁরা নতুন নাগরিক মধ্যবিত্তের রিফর্মেশনের পক্ষপাতী। নতুন বিত্তবান ও বিদ্বানরাও 'আত্মীয় সভা'য় ছিলেন। নতুন বাজা-জমিদার বণিক ও বিদ্বানের এই মিলন প্রসঙ্গে ফন্ মার্টিনের উক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য :[৪]

Money and talent were forced together in face of mediaeval tradition; they met on common ground,

[৪] A. V. Martin : *op. cit.* p. 37

as the typically bourgeois spirit of calculation and of rationally adapting means to ends are a characteristic of both the merchant and the intellectual, the new powers were akin in spirit as well as by choice.

আত্মীয় সভাতেও এই একই স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের জন্য 'বিত্ত' ও 'প্রতিভা'র মিলন হয়েছিল, মধ্যযুগীয় 'ট্রেডিশনে'র বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালেও, উনিশ শতকের অধিকাংশ রাজনৈতিক ও বিদ্বৎ-সভায় এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

রামমোহনের এই 'আত্মীয় সভা'তেই বাংলার রিফর্মেশনের draft-programme বা কর্মসূচীর খসড়া রচিত হয়েছিল বলা চলে। পরবর্তীকালে, বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত অন্তত, এমন কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় নি, যা এই সভাতে অন্তত আলোচিত না হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা উচিত। সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনের বিবরণ থেকে আলোচিত বিষয়-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১৯ সালের ৯ মে'র অধিবেশনের যে-বিবরণ ১৮ মে'র 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা এই :

At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions on diet etc. was freely discussed, and generally admitted —the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy—the practice of Polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned—as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters...

জাতিভেদ, নিষিদ্ধ খাদ্য, বাল্যবৈধব্য, বহুবিবাহ, সতীদাহ-সহমরণ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে এই অধিবেশনে অবাধ আলোচনা হয়েছিল। বোঝা যায়, কেবল এই অধিবেশনেই হয় নি, আরো অনেক অধিবেশনে হয়েছিল এবং 'আত্মীয় সভা' বাইরেতে বেদপাঠ বা ব্রহ্মোপাসনার সভা হলেও, সমাজ-সংস্কার ছিল তার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য। সভার আলোচনায় উল্লেখযোগ্য হল, "the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy"—'condemn' করা হয়েছিল। এই সব আলাপ-আলোচনা ও সমালোচনা নিশ্চয় কেবল আত্মীয় সভার বৈঠকের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না—বাইরের সমাজেও ছড়িয়ে পড়ত। তার রীতিমত সামাজিক প্রতিক্রিয়াও হত নিশ্চয়।

রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র পরে, ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে' ইয়ং বেঙ্গলের শিক্ষাদীক্ষা হয় নবযুগের জাগরণমন্ত্রে। এই অ্যাকাডেমি সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলেছেন : "... it was more like the Academus of Plato, or the Lyceum of Aristotle." প্রথমে অ্যাকাডেমির অধিবেশন হত ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়ীতে (যেখানে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়)। সভায় কেবল দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হত না, দেশাচার ও সামাজিক দুর্নীতি ব্যভিচার কুসংস্কার নিয়েও বিতর্ক হত। লালবিহারী দে লিখেছেন :[৫]

৫ Rev. L. B. Day : *Recollections of Alexander Duff*, Chapter 3, pp. 27-36

> In this grove of the Academus......did the choice spirits of Young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious question of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing...institutions...The young lions of the Academy roared out, week after week...

এই 'Young Lion'-রাই 'Young Calcutta' বা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন: তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, মাধবচন্দ্র মল্লিক। ইয়ং বেঙ্গল দল প্রত্যেকটি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন। আন্দোলন অবশ্য প্রধানত সভাসমিতির বক্তৃতা এবং পত্রিকার লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। রামমোহনের যুগেও তাই ছিল। কিন্তু তাহলেও, রামমোহনের প্রারব্ধ কাজ ইয়ং বেঙ্গল দল, প্রকাশ্য আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে, আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এখানে কেবল 'বিধবাবিবাহে'র কথা উল্লেখ করছি, কারণ বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গে বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে, ইয়ং বেঙ্গলের দ্বিভাষিক মুখপত্র 'The Bengal Spectator' পত্রিকায় 'বিধবাবিবাহ' সম্বন্ধে এই পত্র প্রকাশ করা হয়:

> যে সকল বিষয় সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে—বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন

স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম না হয়· এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব বহুবৎসরাবধি হইতেছে ··কিন্তু যে পর্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণ-রূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয়, তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বাবম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।

১৮৪২ সালের জুলাই মাসে 'Bengal Spectator' পত্রিকায় এ-বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় :

এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না···আমরাও সম্প্রতি হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রের বিপরীত।···এক্ষণে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক ? তাহাতে আমরা এইমাত্র কহিতে পারি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিরা যদ্যপি পুনর্ভূবিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্ব্বসম্মতরূপে প্রচলিত হইতে পারিবে।

যে-সময় 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় এইভাবে 'বিধবাবিবাহ' সম্পর্কে লেখালেখি হয় ১৮৪২ সালে—বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। এই সময় 'স্পেক্টেটরে'র পত্রলেখক বলছেন যে, যে সব বিষয় নিয়ে লোক-সমাজে সর্বদাই আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলছে, তার মধ্যে বিধবাবিবাহ অন্যতম। সম্পাদকীয় মন্তব্যটি আরো উল্লেখ-যোগ্য। তাতে বলা হচ্ছে যে স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবার পুনর্বিবাহের পক্ষে নির্দেশ আছে দেখে তাঁরা আনন্দিত হয়েছেন। সামাজিক জীবনে এই উদ্দেশ্য কিভাবে সফল করা সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে

তাঁরা বলছেন যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হলে হবে না। তাছাড়া, হিন্দু যুবকদের মধ্যে যদি কেউ কেউ সাহস করে দু-চারটি বিধবাবিবাহ করেন তাহলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে লোকের কুসংস্কারজনিত ভীতি ও আপত্তি ধীরে ধীরে কেটে যাবে এবং ক্রমে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবে।

এই আন্দোলন ও বাদানুবাদের মধ্যে কলকাতা শহরে বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। পূর্ণ যৌবনে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, বাদানুবাদ তখন তীব্রতর হয়েছে বোঝা যায়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র সম্পাদকীয় নির্দেশ কতকটা যেন আহ্বানের মতন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুবক পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেই আহ্বান শুনলেন—বিধবাবিবাহ সফল করতে হলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার দরকার এবং কয়েকজন হিন্দু যুবকের বিধবাবিবাহ করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি বাদানুবাদের মধ্যে শুনলেন যে স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রমাণাদিও আছে। অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গল দলের কাছ থেকেই তিনি সমাজসংস্কার-কর্মের পরবর্তী স্তরের পরিষ্কার নির্দেশ পেলেন। চতুর্থ দশকেই যেন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র তাঁর জন্য তৈরি হয়ে রইল। 'ইয়ং বেঙ্গল' যেন তাঁকেই আহ্বান করছিলেন পথ দেখাবার জন্য, যেন সংস্কারক্ষেত্রে তাঁরই অবতরণ প্রত্যাশা করছিলেন।

প্রথম স্তরে রামমোহনের যুগে 'আত্মীয় সভা'র আলাপ-আলোচনা, দ্বিতীয় স্তরে ইয়ং বেঙ্গলের যুগের তীব্র বাদানুবাদ ও আন্দোলন, যেন তৃতীয় স্তরে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকে একদিক থেকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। এমনকি, যে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তনকে তিনি তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' বলে মনে করতেন এবং সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন—

'জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই'—সেই বিধবাবিবাহের আদর্শও পরিষ্কার এই স্তরগুলি অতিক্রম করে তাঁর কর্মজীবনের সামনে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ যে 'বহমান কালগঙ্গা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবন-ধারার মিলন দেখেছিলেন, এবং যে-মিলনের জন্য বিদ্যাসাগর 'আধুনিক' ছিলেন বলেছেন, এই হল সেই বহমান কালগঙ্গা এবং এইভাবে তার সমাজাদর্শের ধারার সঙ্গেই তাঁর জীবনাদর্শের মিলন ঘটেছিল।

প্রসঙ্গত বলছি, উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে বিদ্যাসাগরের সমাজাদর্শের বিচার করবার চেষ্টা করা হয় নি। তাঁর চরিত-কাররা এবং অন্যান্য লেখকরা তাঁর সংস্কারকর্মকে একটা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা মনে করে, তার যৌক্তিকতা, কেউ কেউ অযৌক্তিকতাও, ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। পড়লে মনে হয় যেন কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বিদ্যাসাগর কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে গোঁড়া সমাজের টিকি ধরে সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গটার গুরুত্ব আছে বলে উল্লেখ করছি। হঠাৎ উত্তেজনা বা অনুপ্রেরণার কথা বললে, তার উৎসও একটা সন্ধান করতে হয়। চরিতকাররা ও বিদ্যাসাগর-অনুরাগীরা তার জন্য নানা-রকমের কাহিনীর অবতারণা করেছেন—যেমন গ্রাম্য খেলার সঙ্গিনীর বালবৈধব্যের দুঃখ, মায়ের আবেদন, আরো কত কি? সমকালের ও পরবর্তীকালের শত্রুরা এই 'হঠাৎপ্রেরণা'র সুযোগ নিয়ে বহু কুৎসা প্রচারের সুবিধা পেয়েছেন। বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যার জন্য তাঁর শত্রুরাও তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আক্রমণ করেছেন এবং তাঁর গুণমুগ্ধরাও তাঁর সংস্কারকর্মের প্রকৃত ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের

সংস্কারকর্ম যে কত গভীরভাবে তাঁর যুগধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা আমরা দেখেছি। সমাজসংস্কারের গতিশীল ধারাকে তিনিই একটি স্থনির্দিষ্ট পথে সার্থকতার দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহনের তা করবার প্রয়োজন হয় নি।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে। অর্থাৎ 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বাদানুবাদ, আন্দোলন ও পূর্বোক্ত আবেদনের প্রায় বারো বছর পরে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই দীর্ঘ বারো বছর তিনি কি করেছিলেন? তাঁর 'সর্বপ্রধান সৎকর্মের' প্রেরণা ও আহ্বান বাইরের সমাজ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েও কেন তিনি উৎসাহের আতিশয্যে সেই আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন নি? তার প্রথম কারণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তখনো তিনি নতুন নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। রামমোহন বা ইয়ং বেঙ্গলের অনেকের মতন তিনি বিত্তবান ছিলেন না। প্রতিষ্ঠা তাঁকে বিদ্যার জোরে, এবং বিদ্যার্জিত বিত্তের জোরে অর্জন করতে হয়েছিল। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেজন্যও তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, উৎসাহের আতিশয্য ও হঠকারিতার জন্য, মহৎ আদর্শেরও প্রচারের সামাজিক ফলাফল যে কি রকম অনিষ্টকর হতে পারে, তা তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের অনেকের চরম উগ্র ও অসহিষ্ণু কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তা ছাড়া, উনিশ

শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, আলেকজাণ্ডার ডাফের কলকাতায় আগমনের পরে, ধর্মান্তরের সমস্যা নিয়ে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কার-আন্দোলনের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তা এইসব নানাকারণে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে যে-কোন সংস্কারকর্ম ধর্মবিরোধিতার চোরাগলিতে বদ্ধ হয়ে ব্যর্থ হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর তাই স্থিরভাবে যথার্থ পরিবেশ ও সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি অবশ্য চুপ করে বসে ছিলেন না। এই সময় আসল শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কারকর্মে তিনি ব্রতী ছিলেন। তারই মধ্যে, 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের কথা বলেছিলেন, সেই স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের কাজেও তিনি অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। বৃহত্তর সামাজিক সংস্কারকর্মের জন্য তিনি সবদিক দিয়েই ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তিনি সেই সভা ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে, অক্ষয়কুমার দত্তের মতন বন্ধুদের সহযোগিতায়, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। তারপর ১৮৪৯-৫০ সালে তিনি এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় 'সর্বশুভকরী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়:

> সভা সংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এদেশের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয়, সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক।

এই উদ্দেশ্য প্রচারেব জন্য ১৮৫০ সালে তাঁরই উদ্‌যোগে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লেখা হয় :

আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি, পত্রিকা প্রচার তৎসাধনের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।

প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য-বিবাহের দোষ' প্রবন্ধটি এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্পর্কে রচনা তিনি ও তাঁর সহকর্মী বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার লেখেন। ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়—'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' এই শিরোনামে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি রচনা প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় অক্ষয়কুমার দত্ত এ-বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অক্টোবর মাসে তিনি বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। ডিসেম্বব মাসে আবেদন করেন 'বহুবিবাহ-রহিত' আইন প্রণয়নের জন্য।

এই কার্যক্রম বিচার করলে, পরিষ্কার বোঝা যায়, সামাজিক সংস্কারক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ধীর স্থির বিবেচনাপ্রসূত, কোথাও কোন আকস্মিক প্রেরণার বা উত্তেজনার কোন চিহ্ন নেই। শুধু বিবেচনাপ্রসূত নয়, রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল-যুগের সামাজিক আদর্শের উত্তরাধিকারী যে তিনি এবং কোন বিষয়ই যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, তাও বোঝা যায়।

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তার কয়েকমাস পরে তিনি নিজে উদ্‌যোগী হয়ে, কলকাতা শহরে, প্রথম বিধবাবিবাহ দেন। ১৮৫৫-৫৬-৫৭ সালে তাঁর এইসব সামাজিক ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে, তার আগে বা পরে, আর কোন ব্যক্তির কর্মের ফলে তা হয়েছে বলে মনে হয় না। সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় তার বিস্তারিত চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হয়। কত ছড়া, কত গান, কত কবিতা ও কাহিনী যে তাঁর নামে লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে তার ঠিক নেই। ব্যঙ্গপরিহাস ও ভক্তিরসের যুক্তধারায় বাংলাদেশে বিচিত্র এক লোকসাহিত্য রচিত হয়। বাংলার সামাজিক সাহিত্যও প্রধানত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে এই সময় বিকাশলাভ করে। এ-সবের বিস্তৃত বিবরণ বা পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, দেবার প্রয়োজনও নেই। সেই বিবরণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমে তাঁর এই কর্মপদ্ধতির বা আন্দোলনের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বোঝা। সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য ও ধারাবাহিক আলোচনা শেষ করব।

বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগ রেখেই যে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্মে' অর্থাৎ বিধবাবিবাহের প্রবর্তনাদি সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সর্বপ্রথম সেই কথা মনে রাখা দরকার। কিন্তু তা হলেও, তাঁর কর্মপদ্ধতির ও আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্যও যে ছিল, তাও ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। সেই বৈশিষ্ট্য কি? রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের যুগে এই আন্দোলন সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার

আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর জনসমাজে তার প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি তখন। রামমোহনও সতীদাহপ্রথা ধীরেসুস্থে রহিত করতে চেয়েছিলেন, সরাসরি আইন করে হঠাৎ সে-প্রথা উচ্ছেদ করতে চান নি। তার কারণ, তাঁর সময়ে তাঁর সমর্থক নতুন নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা যেমন অল্প ছিল, তেমনি সেকালের রক্ষণশীল পণ্ডিতশ্রেণীও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের যুগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছিল, আন্দোলনও ক্রমে তীব্রতর হয়েছিল, কিন্তু নতুন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাঁরা প্রধানত ধর্মবিরোধী বা 'anti-religious' আন্দোলনে মেতে উঠেছিলেন বলে, সমাজসংস্কারের বাস্তব পন্থা কেবল নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এই বহমান ধারার সঙ্গে তাঁর কর্মধারার যে মিলন ঘটিয়েছিলেন কেবল তাই নয়, তাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে পরিচালিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনকে বাংলাদেশের প্রকৃত সামাজিক গণ-আন্দোলনের প্রাথমিক প্রকাশ বলা যায়। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের জন্য, তাতে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। আমাদের জাতীয় মহাফেজখানা থেকে এই আবেদনপত্রের ফটো-প্রতিলিপি স্বাক্ষরকারীদের সম্পূর্ণ তালিকাসহ আমি আনিয়েছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সামাজিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্বাক্ষরসহ এই আবেদনপত্রখানি অমূল্য দলিল। প্রায় ৩৮ ফুলস্কেপ পৃষ্ঠাব্যাপী নামের স্বাক্ষর আছে আবেদন-পত্রে, গুণে দেখেছি ৯৮৭ জনের, তার মধ্যে ৯৮৭ নং বা শেষ স্বাক্ষরটি বিদ্যাসাগরের। বর্তমান কালে যাঁরা 'signature

campaign' করেন, তাঁরা এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কৌশল ও তার গুরুত্ব নিশ্চয় জানেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মীদের সংগৃহীত এই স্বাক্ষরগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সামাজিক শ্রেণীর দিক থেকে, জাতি ও বর্ণের দিক থেকে, এমন কোন স্তরের লোক নেই যাঁদের সমর্থন তিনি যথেষ্ট পরিমাণে পান নি এই কাজের জন্য যে সংগঠনের ও উদ্যমের প্রয়োজন হয়েছিল এবং যে ব্যাপক ক্ষেত্র পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল, ১৮৫৫ সালে, আজ থেকে একশ বছর আগে, গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক থেকে ভাবলে তা অভাবনীয় ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল আবেদনে ও আইনপাশে ক্ষান্ত না হয়ে তিনি যে বাস্তবক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ দিতে, সর্বস্বপণ করে নিজে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, তাতেও বোঝা যায় তিনি কতখানি 'প্র্যাক্‌টিকাল' বা বাস্তব-পন্থী ছিলেন। ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রে ইয়ং বেঙ্গল দল বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যে কর্তব্যের ইঙ্গিত করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম আমাদের দেশে সেই মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হন। এইভাবে রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল যুগের আদর্শকে বিদ্যাসাগর বাস্তবে পরিণত করে তার সার্থক পরিণতির পথ দেখিয়েছিলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের ও আদর্শের ঐতিহাসিক সার্থকতা। বহুবিবাহ আইনত রহিত করার প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। বিধবাবিবাহও সমাজে তেমন-ভাবে প্রচলিত হয় নি তখন, আজও হয় নি। সেদিক দিয়ে তাও অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। কিন্তু কোন গতিশীল সামাজিক আদর্শের সংগ্রামের ব্যর্থতা কেবল তার সাময়িক অনুষ্ঠানের ফলাফল দিয়ে বিচার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনের 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবমুখিন আদর্শ যেমন তাঁর

ব্যক্তিগত চরিত্রে তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি। সেইখানেই তার আসল ঐতিহাসিক সার্থকতা।

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থের ঐতিহাসিক পটভূমির নির্ঘণ্ট

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা। ডেভিড হেয়ারের কলকাতা আগমন (আনুমানিক)।

১৮১৪ : এই বছরের মাঝামাঝি থেকে রামমোহন রায়ের স্থায়ী ভাবে কলকাতায় বাস।
২২ জুলাই। কলকাতায় প্যারী-চাঁদ মিত্রের জন্ম।
২১ অক্টোবর। কলকাতায় রামগোপাল ঘোষের জন্ম।

১৮১৫ : রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' স্থাপন।
অনুবাদ ও ভাষ্যসহ রাম-মোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ। বাংলা ভাষায় রামমোহনই বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার।

১৮১৭ : ২০ জানুয়ারী। কলকাতায় 'হিন্দু কলেজে'র প্রতিষ্ঠা।
১৫ মে। কলকাতার জোড়া-সাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।
৪ জুলাই। 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।
নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম।

১৮১৮ : এই বছর, ১৪ মে থেকে ৯ জুলাইএর মধ্যে কোন তারিখে, কলকাতা থেকে গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক 'বাঙ্গাল গেজেটি' সংবাদপত্র প্রকাশ। খাস কলকাতা শহর থেকে প্রকাশিত, বাঙালী প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'।
এই বছর এপ্রিল মাসে শ্রীরাম-পুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র (মাসিক) 'দিগ্দর্শন' এবং ২৩ মে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়।
১লা সেপ্টেম্বর। 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।
নবেম্বর। রামমোহনের 'সহ-মরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশ।

১৮১৯ : নবেম্বর। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশ।

১৮২০ : ১৫ জুলাই। বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম।
২৬ সেপ্টেম্বর। মেদিনীপুর জেলার (তদানীন্তন হুগলী) বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৮২১ : সেপ্টেম্বর। রামমোহন-

রায়ের 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি' নামে একটি সভা স্থাপন।

১৮২২ : ১৬ফেব্রুয়ারী। কলকাতার শুঁড়ায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম।
২৬ ডিসেম্বর। দক্ষিণ ২৪-পরগণার হরিনাভি গ্রামে 'নাটুকে' রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম।

১৮২৪ : ১লা জানুয়ারী। ৬৬ নং বহুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে 'সংস্কৃত কলেজে'র পাঠারম্ভ।
২৫ জানুয়ারী। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন দত্তের জন্ম। কেউ কেউ বলেন, ১৮২৪ সালের শেষে অথবা ১৮২৫ সালের গোড়ার দিকে মধুসূদনের জন্ম।
২৫ ফেব্রুয়ারী। গোলদীঘিতে 'সংস্কৃত কলেজে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। 'হিন্দু কলেজ' ও 'স্কুলে'র জন্যও সংলগ্ন গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা।

১৮২৬ : ১লা মে। সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু কলেজ ও স্কুল সহ) গোলদীঘির নবনির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত।
মাত্র ১৭ বছর বয়সে ডিরোজিওর হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে যোগদান।

১৮২৭-২৮ : ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্রদের উদ্‌যোগে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা।

১৮২৮ : ২০ অগস্ট। রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে সভা স্থাপন।

১৮২৯ : ৪ ডিসেম্বর। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সহমরণ-সতীদাহ-প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা।

১৮৩০ : ১৭ জানুয়ারী। রক্ষণশীল হিন্দুদের 'ধর্মসভা' নামে সভা স্থাপন।
২৩ জানুয়ারী। জোড়াসাঁকোর নূতন বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের কার্যারম্ভ।
২৭ মে। আলেকজাণ্ডার ডাফের সস্ত্রীক কলকাতায় আগমন।
১৯ নবেম্বর। রামমোহনের বিলাতযাত্রা।

১৮৩১ : ২৫ এপ্রিল। হিন্দুধর্ম-বিরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত।
১৮ জুন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ।
২৬ ডিসেম্বর। ডিরোজিওর মৃত্যু।

১৮৩৩ : ২৭ সেপ্টেম্বর। ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু।

১৮৩৮ : ১৬ মে। 'সাধারণ

জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠা।
২৬ জুন। নৈহাটি-কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।

১৮৩৯: ৬ অক্টোবর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা। প্রথমে নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

১৮৪১: ৪ ডিসেম্বর। সংস্কৃত কলেজে বার বছর, পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন সমাপ্ত।
২৯ ডিসেম্বর। ঈশ্বরচন্দ্রের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান।

১৮৪২: ডিসেম্বর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে সমাজসংস্কারক জর্জ টমসনের ইংলণ্ড থেকে এদেশে আগমন।

১৮৪৩: ৯ ফেব্রুয়ারী। আর্চ-ডিকন ডিয়াল্‌ট্রি কর্তৃক মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চে 'মাইকেল' নাম দিয়ে মধুসূদন দত্তকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা।
২০ এপ্রিল। 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।
১৬ অগস্ট। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ।
২১ ডিসেম্বর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা।

১৮৫১: ২২ জানুয়ারী। বিদ্যা-সাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ।
৩১ অক্টোবর। 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা।
ডিসেম্বর। 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৫: ৪ অক্টোবর। বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্র প্রেরণ।
২৭ ডিসেম্বর। বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আবেদন।

১৮৫৬: ১৬ জুলাই। বিধবাবিবাহ আইন পাশ।
৭ ডিসেম্বর। কলকাতায় প্রথম বিধিসম্মত বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান।

১৮৫৭: সিপাহী বিদ্রোহ।

১৮৫৮: ৩ নবেম্বর। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ।

১৫ নবেম্বর। 'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ।

১৮৫৯-৬০ : নীল বিদ্রোহ। 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ।

১৮৬১ : মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রকাশ।
বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্রহণ।
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৬৩ : ১২ জানুয়ারী। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম।

১৮৬৫ : বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' (প্রথম বাংলা উপন্যাস ?) প্রকাশ।

১৮৬৬ : ১১ নবেম্বর। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল কর্তৃক 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন। এই সময় থেকে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের নাম হল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'।
১ ফেব্রুয়ারী। বহুবিবাহ রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়বার আবেদন।

১৮৬৭ : 'হিন্দু মেলা'র প্রথম অধিবেশন।
'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'র প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২ : বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ।
তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ।

১৮৭৩ : জানুয়ারী। বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'মেট্রোপলিটান কলেজ' প্রতিষ্ঠা। "দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।" অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২।

১৮৭৫ : ১৫ মার্চ। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ, বেলঘরিয়ার তপোবনে।

১৮৭৮ : তরুণ ব্রাহ্মদের 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্র প্রকাশ।

১৮৮১ : নবেম্বর। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৮৩ : ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর। কলকাতার 'অ্যালবার্ট হলে' ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন।

১৮৮৫ : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

১৮৯১ : ২৯ জুলাই। কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।